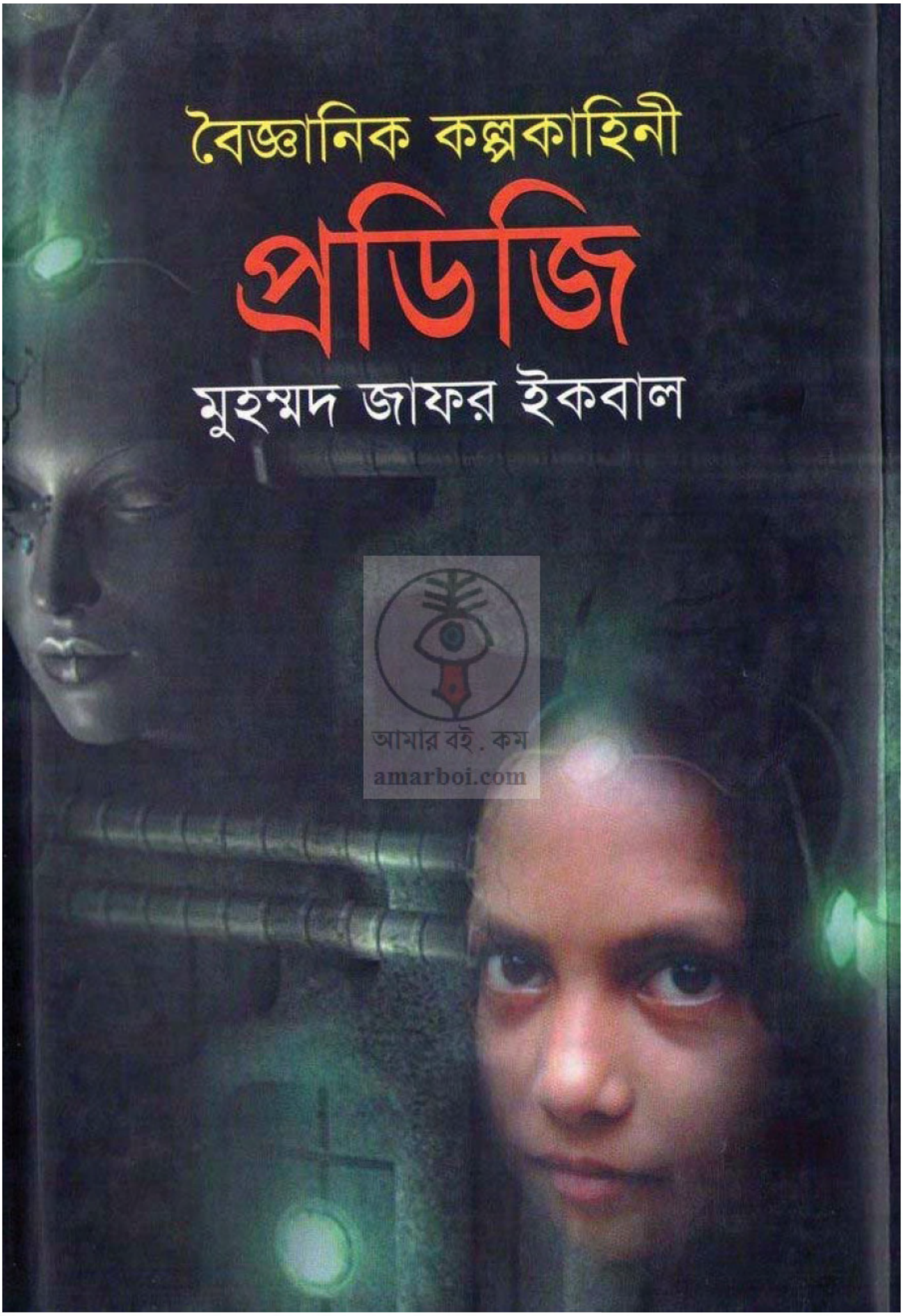
বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী
প্রডিজি
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
আমার বই . কম
amarboi.com

উৎসর্গ

সায়মা ছবি আঁকে, কবিতা লেখে, গণিত অলিম্পিয়াডে পুরস্কারও পায়। একদিন সে আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেছে, আমি তখন হতবাক হয়ে জানলাম, তার জীবনটি তছনছ হয়ে গেছে। অ্যাকসিডেন্টে সে পুরোপুরি চলৎশক্তিহীন, নিঃশ্বাসটুকুও নিতে হয় যন্ত্র দিয়ে। সারা শরীরে সে শুধু একটি আঙুল নাড়াতে পারে। সেই আঙুল দিয়েই সে ছবি আঁকে, কবিতা লেখে। মোবাইল টেলিফোনে এসএমএস করে, সে আমাকে তার ভারি সুন্দর কবিতাগুলো পাঠাত। আমি তাকে বলেছিলাম, যখন বেশ কিছু কবিতা লেখা হবে, তখন একুশে বইমেলায় তার একটি বই বের করে দেব।

আমার বই . কম
amarboi.com

কিছুদিন আগে তার এক বান্ধবী আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, সায়মা মারা গেছে; তার কবিতার বইটি আর বের করা হলো না।

যারা সায়মার মতো কখনো জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতে জানে না, এই বই তাদের উদ্দেশে।

১.

সিঁড়ি দিয়ে বেশ কয়েকটা মেয়ে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে নেমে আসছে, রাফি একটু সরে গিয়ে তাদের জায়গা করে দিল। মেয়েগুলো রাফিকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেল, তাকে ভালো করে লক্ষও করল না। লক্ষ করার কথা নয়—সে আজ প্রথম এই ডিপার্টমেন্টে লেকচারার হিসেবে যোগ দিতে এসেছে, মাত্র ডিগ্রি শেষ করেছে, তার চেহারায় এখনো একটা ছাত্র-ছাত্র ভাব, তাই তাকে ছেলেমেয়েরা আলাদাভাবে লক্ষ করবে, সেটা সে আশাও করে না। দোতলায় উঠে করিডর ধরে সে হাঁটতে থাকে, ছেলেমেয়েরা ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গল্পগুজব করছে, সাহসী একটা মেয়ে নির্বিকারভাবে রেলিংয়ে পা তুলে বসে আছে। তাকে কেউ চেনে না, তাই কেউ তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিল না, রাফি ছেলেমেয়েদের মাঝখানে জায়গা করে করে সামনের দিকে হেঁটে যায়।

করিডরের শেষ মাথায় হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্টের রুম। দরজাটা খোলা, রাফি পর্দা সরিয়ে মাথা ঢুকিয়ে একনজর দেখল। বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলে পা তুলে দিয়ে প্রফেসর জাহিদ হাসান তাঁর চেয়ারে আধা শোয়া হয়ে একটা বই দেখছেন। রাফি এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আসতে পারি, স্যার?"

প্রফেসর জাহিদ হাসান চোখের কোনা দিয়ে তাকে দেখে আবার বইয়ের পাতায় চোখ ফিরিয়ে বললেন, "আসো।"

রাফি বুঝতে পারল, প্রফেসর জাহিদ হাসান তাকে চিনতে পারেননি। সে এগিয়ে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "স্যার, আমি রাফি আহমেদ।"

প্রফেসর জাহিদ হাসান বই থেকে চোখ না তুলে বললেন, "বলো রাফি আহমেদ, কী দরকার?"

"স্যার, আমি এই ডিপার্টমেন্টে জয়েন করতে এসেছি।"

প্রফেসর হাসান হঠাৎ করে তাকে চিনতে পারলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি টেবিল থেকে পা নামালেন এবং খুব একটা মজা হয়েছে, সে রকম ভঙ্গি করে বললেন, "আই অ্যাম সরি, রাফি! আমি ভেবেছি, তুমি একজন ছাত্র!"

রাফি মুখে একটু হাসি-হাসি ভাব ধরে রাখল। প্রফেসর জাহিদ হাসান হঠাৎ ব্যস্ত হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, "বসো, বসো রাফি, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

রাফি সামনের চেয়ারটায় বসে। চোখের কোনা দিয়ে প্রফেসর জাহিদ হাসানের অফিস ঘরটি দেখে। বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলটি কাগজপত্র, বই-খাতায় বোঝাই, সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই। শুধু যে টেবিলে বই-খাতা, কাগজপত্র তা নয়, প্রায় সব চেয়ারেই বই, খাতাপত্র রয়েছে। পাশে ছোট একটা টেবিলে একটা কম্পিউটার, পুরোনো সিআরটি মনিটর। চারপাশে শেলফ এবং সেখানে নানা রকম বই। শেলফের ওপর কিছু কাপ, শিল্ড আর ক্রেস্ট। ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা দৌড়-ঝাঁপ করে সম্ভবত এগুলো পেয়েছে।

আমার বই . কম
amarboi.com

প্রফেসর জাহিদ হাসান বললেন, "তুমি কখন এসেছ? কোনো সমস্যা হয়নি তো?"

"সকালে পৌঁছেছি। কোনো সমস্যা হয়নি।"

"কোথায় উঠেছ?"

"গেস্ট হাউসে।"

"গুড।" প্রফেসর হাসান গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, "জাহানারা, জাহানারা।"

পাশের অফিস ঘর থেকে হালকা-পাতলা একটা মেয়ে হাতে কিছু কাগজপত্র নিয়ে ঢুকে বলল, "জি স্যার।"

"এই হচ্ছে রাফি আহমেদ। আমাদের নতুন টিচার। তুমি এর জয়েনিং লেটারটা রেডি করো।"

"জি স্যার।"

"আর রাফি, তুমি জাহানারাকে চিনে রাখো। কাগজে-কলমে আমি এই ডিপার্টমেন্টের হেড, আসলে ডিপার্টমেন্ট চালায় জাহানারা। ও যেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাবে, আমিও সেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

জাহানারা নামের হালকা-পাতলা মেয়েটি বলল, "স্যার, আপনি যেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাবেন, আমিও সেদিন চাকরি ছেড়ে চলে যাব।"

"গুড। তাহলে আমিও আছি, তুমিও আছ।" প্রফেসর জাহিদ হাসান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "চলো, তোমার সঙ্গে অন্য সবার পরিচয় করিয়ে দিই।"

রাফি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে, স্যার।"

প্রফেসর হাসান তাঁর অফিস থেকে বের হয়ে করিডর ধরে হাঁটতে থাকেন, একটু আগে যে ছেলেমেয়েগুলো ভিড় করে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে কথা বলছিল, তারা এবার তাদের গলা নামিয়ে ফেলল। তারা হাত তুলে প্রফেসর হাসানকে সালাম দেয় এবং দুই পাশে সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দেয়। যে সাহসী মেয়েটি রেলিংয়ের ওপর নির্বিকারভাবে বসেছিল, সেও তড়াক করে লাফ দিয়ে নিচে নেমে মুখে একটা শিশুসুলভ নিরীহ ভাব ফুটিয়ে তোলে। প্রফেসর হাসান একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেলেন, ঘরের চার কোনায় চারটা ডেস্ক, তিনটিতে যে তিনজন বসেছিল, তারা তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে যায়। দুজন ছেলে এবং একজন মেয়ে, এরাও শিক্ষক, এবং এদেরও দেখে শিক্ষক মনে হয় না, চেহারায় একটা ছাত্র-ছাত্র ভাব রয়ে গেছে। প্রফেসর জাহিদ হাসান বললেন, "এই যে, এ হচ্ছে রাফি আহমেদ। আমাদের নতুন কলিগ!"

আমার বই.কম
amarboi.com

"ও!" বলে তিনজনই তাদের ডেস্ক থেকে বের হয়ে কাছাকাছি চলে আসে। প্রফেসর হাসান পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এ হচ্ছে কবির, এ হচ্ছে রানা আর এ হচ্ছে সোহানা। এর বাড়ি সিলেট, তাই নিজের নামটাও ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। বলে সুহানা।"

সোহানা নামের মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, "স্যার, আমি ঠিকই সোহানা উচ্চারণ করতে পারি। কিন্তু আমার নাম সোহানা না, আমার নামই সুহানা! তা ছাড়া আমার বাড়ি সিলেট না, আমার বাড়ি নেত্রকোনা।"

প্রফেসর হাসান হাসলেন। বললেন, "আমি জানি। একটু ঠাট্টা করলাম।" তারপর রাফির দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, "এরা তিনজনই আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট। নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার হয়েছে তো, তাই এদের ভেতর হালকা একটু মাস্তানি ভাব আছে, তাই এদের একটু তোয়াজ কোরো, না হলে এরা কিন্তু তোমার জীবন বরবাদ করে দেবে।"

কবির নামের ছেলেটি বলল, "স্যার, মাত্র এসেছে, আর আপনি আমাদের মাস্তান-টাস্তান কত কিছু বলে দিলেন!"

প্রফেসর হাসান হাসলেন, "ডন্ট ওরি। রাফি খুব স্মার্ট ছেলে, শুধু শুধু আমি তাকে টিচার হিসেবে নিইনি। সে ঠিকই বুঝে নেবে, আসলেই তোমরা মাস্তান হলে আমি তোমাদের মাস্তান হিসেবে পরিচয় করাতাম না। ঠিক কি না?"

রাফি কী বলবে বুঝতে না পেরে হাসি হাসি মুখ করে মাথা নাড়ল। সে টের পেতে শুরু করেছে, তার বুকের ভেতর ভারটা আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে। নতুন জায়গায় প্রথমবার কাজ করতে এসে কীভাবে সবকিছু সামলে নেবে, সেটা নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল, সেই দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে উবে যেতে শুরু করেছে। ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের মধ্যে খুব সহজ একটা সম্পর্ক আছে, সেটা সে বুঝতে শুরু করেছে।

এ রকম সময় দরজার পর্দা সরিয়ে আরেকজন মাথা ঢোকাল, কবির নামের ছেলেটি তাকে ডাকল, "স্যার আসেন, আমাদের নতুন টিচার জয়েন করেছে।"

পর্দা সরিয়ে বিষণ্ন চেহারার একটা মানুষ ভেতরে এসে ঢোকে। রাফির কাছাকাছি এসে বলে, "তুমি তাহলে আমাদের নতুন টিচার? গুড। আইসিটি কনফারেন্সে তুমি নিউরাল কম্পিউটারের ওপর একটা পেপার দিয়েছিলে?"

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "জি স্যার।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"ভালো পেপার, পালিশ-টালিশ করলে ভালো জার্নালে পাবলিশ হয়ে যাবে। কাজটা কে করেছিল? তুমি, না তোমার স্যার?"

"আইডিয়াটা স্যার দিয়েছিলেন, কাজটা আমার। আর প্রথম যে আইডিয়াটা ছিল, সেখান থেকে অনেক চেঞ্জ হয়েছে।"

"তা-ই হয়। তা-ই হওয়ার কথা।"

প্রফেসর জাহিদ হাসান বললেন, "ইনি হচ্ছেন ডক্টর রাশেদ। আমাদের নতুন ইউনিভার্সিটি, সিনিয়র টিচারের খুব অভাব। ষোলোজন টিচারের মধ্যে মাত্র আটজন ডক্টরেট। রাশেদ হচ্ছেন সেই আটজনের একজন।"

রাফি বলল, "জানি স্যার। যখন ইন্টারভিউ দিতে এসেছিলাম, তখন সব খোঁজখবর নিয়েছিলাম।"

"গুড। তাহলে তো ভালো।"

রাশেদ জিজ্ঞেস করল, "একে কোথায় বসতে দেবেন, স্যার?"

"তোমরা বলো।"

রানা নামের ছেলেটি বলল, "মহাজন পট্টিতে সোহেলের রুমটা খালি আছে।"

"মহাজন পট্টিতে পাঠাবে?"

মহাজন পট্টি শুনে রাফির চোখে-মুখে দুশ্চিন্তার একটু ছায়া পড়ল, সেটা দেখে বিষণ্ন চেহারার রাশেদ হেসে ফেলল, হাসলেও মানুষটির চেহারা থেকে বিষণ্নভাব দূর হয় না। হাসতে হাসতে বলল, "মহাজন পট্টি শুনে তোমার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তিনতলায় যে এক্সটেনশন হয়েছে, সেখানে করিডরটা সরু, তাই সবাই নাম দিয়েছে মহাজন পট্টি।"

এবার রাফিও একটু হাসল, বলল, "ও আচ্ছা। আমাদের হোস্টেলেও একটা উইংয়ের নাম ছিল শাঁখারী পট্টি।"

ঠিক এ রকম সময় দরজার পর্দা সরিয়ে জাহানারা উঁকি দেয়, "স্যার, আপনাকে ভিসি স্যার খুঁজছেন। ফোনে আছেন।"

"আসছি।" প্রফেসর হাসান কম বয়সী ছেলেমেয়ে তিনজনকে বললেন, "তোমরা রাফিকে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। ওর অফিসটাও দেখিয়ে দাও। আর রাশেদ, তুমি একটু আসো আমার সঙ্গে।"

প্রফেসর হাসান রাশেদকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর কবির, রানা আর সোহানা তাদের ডেস্কের সামনে রাখা চেয়ারগুলো ঘুরিয়ে নিয়ে বসে, রাফির দিকেও একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, "বসো রাফি।"

আমার বই.কম
amarboi.com

রাফি চেয়ারটায় বসে চোখের কোনাটি দিয়ে ঘরটি লক্ষ করল, এই বয়সী চারজন ছেলেমেয়ে এ রকম একটা ঘরে বসলে ঘরটির যে রকম দুরবস্থা হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একজনের ডেস্কে একটা ল্যাপটপ, অন্য তিনটিতে এলসিডি মনিটর। পেছনে স্টিলের আলমারি, দেয়ালে খবরের কাগজের ফ্রি ক্যালেন্ডার স্কচটেপ দিয়ে লাগানো।

কবির রাফির দিকে তাকিয়ে বলল, "স্যার তোমার কথা বলছিলেন, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে বহু দিন বাইরের কাউকে নেওয়া হয়নি। এবার তোমাকে নেওয়া হলো।"

রানা জিজ্ঞেস করল, "তুমি এ রকম হাইফাই ইউনিভার্সিটি থেকে আমাদের ভাঙাচোরা ইউনিভার্সিটিতে চলে এলে, ব্যাপারটা কী?"

রাফি মাথা নাড়ল, "আমাদের ইউনিভার্সিটি মোটেও হাইফাই ইউনিভার্সিটি না। আর আপনাদের ইউনিভার্সিটিও মোটেই ভাঙাচোরা ইউনিভার্সিটি না! তা ছাড়া বাইরে আপনাদের ইউনিভার্সিটি, বিশেষ করে আপনাদের ডিপার্টমেন্টের একটা আলাদা সুনাম আছে।"

সুহানা বলল, "জাহিদ স্যারের জন্য।"

রাফি বলল, "জাহিদ স্যারকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে।"

সুহানা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, স্যার খুব সুইট।"

"স্যার যেভাবে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আর আপনারা যেভাবে স্যারের সঙ্গে কথা বলছেন, আমার ইউনিভার্সিটিতে আমরা সেটা কল্পনাও করতে পারব না। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে গাদা গাদা সব প্রফেসর। কেউ কোনো কাজ করে না, কিন্তু সবার সিরিয়াস ইগো প্রবলেম।"

রানা বলল, "একেকটা ইউনিভার্সিটির একেক রকম কালচার। আমাদের ইউনিভার্সিটি তো নতুন, তাই এখনো এ রকম আছে, দেখতে দেখতে ইগো প্রবলেম শুরু হয়ে যাবে। যাই হোক, তুমি কোথায় উঠেছ?"

"গেস্ট হাউসে।"

"কোথায় থাকবে, কী করবে, কিছু ঠিক করেছ?"

"না। এখনো ঠিক করিনি। আপনাদের একটু হেল্প নিতে হবে।"

"নো প্রবলেম।"

কবির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল। বলল, "আমার একটা ক্লাস আছে। রানা, তুই রাফিকে তার অফিসটা দেখিয়ে দিস।"

সুহানা বলল, "অফিসটা খালি দেখিয়ে দিলেই হবে নাকি? সোহেল অফিসটা কীভাবে রেখে গেছে, জানিস? আমাকে যেতে হবে।"

কবির হা হা করে হাসল। বলল, "ঠিকই বলেছিস। ভুলেই গেছিলাম যে সোহেলটা একটা আস্ত খবিশ ছিল!"

রানা বলল, "ওই অফিসে আধখাওয়া পিৎজা থেকে শুরু করে মড়া ইন্দুর—সবকিছু পাওয়া যাবে!"

সুহানা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি অফিস থেকে চাবি নিয়ে আসি।"

রানা বলল, "আমি দেখি, গৌতমকে পাই নাকি। ঘরটা একটু পরিষ্কার করতে হবে।"

কবির ক্লাস নিতে গেল, সুহানা গেল অফিসের চাবি আনতে আর রানা বের হয়ে গেল গৌতম নামের মানুষটিকে খুঁজে বের করতে, সম্ভবত এই বিল্ডিংয়ের ঝাড়ুদার। রাফি উঠে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। একটু দূরে এক সারি কৃষ্ণচূড়াগাছ, গাছের নিচে অনেকগুলো টংঘর, সেখানে ছেলেমেয়েরা আড্ডা মারছে, চা খাচ্ছে। রাফি অন্যমনস্কভাবে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা ব্যাপার আবিষ্কার করল। সে যে ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে, সেখানে সবাই অন্য রকম—কাউকে কোনো

আমারবই.কম
amarboi.com

দায়িত্ব দেওয়া হলে প্রথমেই সে চেষ্টা করবে, কোনো একটা অজুহাত দিয়ে সেটা থেকে বের হয়ে আসতে। সবার ভেতর যে হাবাগোবা, শেষ পর্যন্ত তার ঘাড়ে সেই দায়িত্বটা পড়ে এবং খুবই বিরস মুখে সে সেই কাজটা করে। কোথাও কোনো আনন্দ নেই। এখানে অন্য রকম। কবির রানাকে বলল অফিসটা দেখিয়ে দিতে। সুহানা নিজে থেকে বলল তাকেও যেতে হবে। রানা তখন গেল ঝাড়ুদার খুঁজতে। খুবই ছোট ছোট কাজ কিন্তু এই ছোট ছোট কাজগুলো দিয়েই মনে হয় মানুষের জীবনটা অন্য রকম হয়ে যায়।

মহাজন পট্টিতে সোহেল নামের খবিশ ধরনের ছেলেটির অফিসটিকে যত নোংরা হিসেবে ধারণা দেওয়া হয়েছিল, সেটি মোটেও তত নোংরা নয়। টেবিলে এবং ফ্লোরে অনেক কাগজ ছড়ানো। ড্রয়ারে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ময়লা একটা দুই টাকার নোট এবং নাদুসনুদুস একটি মেয়ের সঙ্গে সোহেলের একটা ছবি ছিল। সেটা নিয়েই সুহানা এবং রানা নানা ধরনের টিপ্পনী কাটল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরটি পরিষ্কার হয়ে গেল এবং গৌতম নামের মানুষটি ঝাড়ু দিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করে নেওয়ার পর সেটি রীতিমতো তকতকে হয়ে ওঠে। সুহানা একটি পুরোনো টাওয়েল দিয়ে ডেস্কটি মুছে একটি রিভলভিং চেয়ার টেনে নিয়ে বলল, "নাও, বসো।"

আমার বই . কম
amarboi.com

রাফি বসতে বসতে বলল, "আমাকে কী ক্লাস নিতে হবে, জানেন?"

"কোয়ান্টাম মেকানিকস!"

"সর্বনাশ!"

"সর্বনাশের কিছু নেই, ইনট্রোডাক্টরি ক্লাস। এই ব্যাচের পোলাপানগুলো ভালো। আগ্রহ আছে।"

"ক্লাসের রুটিন কোথায় পাব, বলতে পারবেন?"

সুহানা বলল, "আমাদের সঙ্গে আপনি আপনি করার দরকার নেই, আমরা একই ব্যাচের!"

"থ্যাংক ইউ। ক্লাসের রুটিন কোথায় পাব, বলতে পারবে?"

"অফিসে আছে, জাহানারা আপু এতক্ষণে নিশ্চয়ই তোমার জন্য সবকিছু রেডি করে ফেলেছে। শি ইজ এ সুপার লেডি!"

"হ্যাঁ। জাহিদ স্যারও বলছিলেন।"

রানা বলল, "তাহলে চলো, তোমাকে আমাদের ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিই।"

"হ্যাঁ।" সুহানা হেসে বলল, "বাথরুমগুলো কোথায়, কোন টয়লেটের দরজা ভাঙা, মেয়েদের কমনরুম কোথায়!"

রানা বলল, "তার সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবগুলো কোথায়, অন্য টিচাররা কে কোথায় বসে!"

"এবং কোন কোন টিচার থেকে সাবধানে থাকতে হবে!"

রানা অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে বলল, "এবং কেন সাবধানে থাকতে হবে?"

ডায়াসের ওপর দাঁড়িয়ে রাফি সামনে বসে থাকা জনাপঞ্চাশেক ছাত্রছাত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু নার্ভাস অনুভব করে। এই মাত্র প্রফেসর জাহিদ হাসান

তাকে ক্লাসের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেছেন। প্রথম দিন জয়েন করে দুই ঘণ্টার মধ্যেই তাকে জীবনের প্রথম ক্লাস নিতে হবে, সে বুঝতে পারেনি। প্রফেসর জাহিদ হাসান অবশ্যি তাকে ক্লাস নিতে বলেননি, তার ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে একটু পরিচিত হতে বলেছেন। রাফি জীবনে কখনো কোনো ক্লাস নেয়নি। কাজেই প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রছাত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর তাদের ক্লাস নেওয়ার মধ্যে তার কাছে খুব বড় কোনো পার্থক্য নেই! সে তার গলাটা একটু পরিষ্কার করে বলল, "এটা আমার জীবনের প্রথম ক্লাস। আজকের এই ঘটনার কথা তোমরা সবাই ভুলে যাবে কিন্তু আমি কোনো দিন ভুলব না।"

আমার বই. কম
amarboi.com

দুষ্টু টাইপের একটা মেয়ে বলল, "স্যার, এখন আপনার কেমন লাগছে?"

"সত্যি কথা বলব?"

এবার অনেকেই বলল, "জি স্যার, বলেন।"

"আমার খুব নার্ভাস লাগছে।"

ক্লাসে ছোট একটা হাসির শব্দ শোনা গেল। দয়ালু চেহারার একটা ছেলে বলল, "নার্ভাস হওয়ার কিছু নাই, স্যার।"

"থ্যাংকু। কিন্তু তুমি যদি কোনো দিন স্যার হও, তখন তুমি যদি কোনো দিন ছেলেমেয়েভর্তি ক্লাসে দাঁড়িয়ে লেকচার দেওয়ার চেষ্টা করো, তখন তুমি আমার অবস্থাটা বুঝতে পারবে!"

আবার ক্লাসের ছেলেমেয়েরা শব্দ করে হেসে উঠল। হাসির একটা গুণ আছে, মানুষ খুব সহজেই সহজ হয়ে যায়। রাফিও অনেকটা সহজ হয়ে

গেল। বলল, "আজ যেহেতু একেবারে প্রথম দিন, তাই আজ ঠিক পড়াব না, কীভাবে পড়াব বরং সেটা নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি।"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা উৎসুক দৃষ্টিতে রাফির দিকে তাকিয়ে একটু নড়েচড়ে বসল। রাফি বলল, "আমি তোমাদের যে কোর্সটা নেব, সেটার নাম ইনট্রোডাকশন টু কোয়ান্টাম মেকানিকস। আমি যখন এই কোর্সটা প্রথম নিই, তখন যে স্যার এই কোর্সটা আমাদের পড়িয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বুড়ো এবং বদমেজাজি। এখন আমার সন্দেহ হয়, আমার সেই স্যার মনে হয় বিষয়টা কোনো দিন নিজেও বোঝেননি। শুধু কিছু ইকুয়েশন মুখস্থ করে রেখেছিলেন। ক্লাসে এসে বোর্ডে সেগুলো লিখতেন। আমরা সেগুলো খাতায় লিখতাম। ক্লাসে প্রশ্ন করার কোনো সুযোগ ছিল না!"

রাফি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "পরের সেমিস্টারে যে ম্যাডাম এই কোর্সটা নিলেন, তিনি ছিলেন কম বয়সী এবং হাসিখুশি। তাঁকে কোনো প্রশ্ন করলে তিনি এত নার্ভাস হয়ে যেতেন যে আমাদের মায়া হতো। তাই আমরা কোনো দিন তাঁকে প্রশ্ন করিনি। সেমিস্টারের শেষে ম্যাডাম দশটা প্রশ্ন বোর্ডে লিখে দিতেন, তার থেকে পরীক্ষায় ছয়টা প্রশ্ন আসত! সে জন্য সবাই সেই ম্যাডামকে খুব ভালোবাসত।"

আমার বই. কম
amarboi.com

সামনে বসে থাকা দুষ্টু টাইপের মেয়েটি বলল, "এ রকম স্যার-ম্যাডামকে আমরাও খুব ভালোবাসি!"

তার কথা শুনে ক্লাসের সবাই হেসে ওঠে। রাফিও হেসে বলল, "আমি জানি, এ রকম স্যার-ম্যাডামকে ছেলেমেয়েরা খুব ভালোবাসে। যা-ই হোক, যেটা বলছিলাম, আমি এই সাবজেক্টটা কোনো ভালো টিচারের কাছে পড়তে পারিনি! কাজেই কীভাবে ভালো করে এই সাবজেক্টটা পড়াতে হয়, আমি জানি না। তবে আমি একটা জিনিস জানি!" রাফি একটু থেমে সারা ক্লাসের ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, "কেউ বলতে পারবে, আমি কী জানি?"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা বলতে পারল না। রাফি বলল, "কীভাবে এই সাবজেক্টটা পড়ানো উচিত নয়, আমি সেটা জানি!"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আবার হেসে উঠল। রাফি বলল, "কাজেই আমি নিজে নিজে যেভাবে এটা শিখেছি, আমি তোমাদের সেভাবে শিখাব। ঠিক আছে?"

ক্লাসের সবাই মাথা নাড়ল। বলল, "ঠিক আছে।" রাফি সারা ক্লাসে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, "তবে এ ব্যাপারে একটা বড় সমস্যা আছে। সমস্যাটা কী, জান?"

ছেলেমেয়েরা মাথা নেড়ে জানাল, তারা জানে না। রাফি বলল, "আমি মাত্র পাস করে এসেছি। কাজেই আমি কিন্তু খুব বেশি জানার সুযোগ পাইনি। তোমরাও আর দুই-তিন বছর পর আমার জায়গায় আসবে! আমার নলেজ"—রাফি দুই আঙুল দিয়ে ছোট একটা গ্যাপ দেখিয়ে বলল, "তোমাদের নলেজ থেকে বড়জোর দুই ইঞ্চি বেশি! কাজেই তোমরা যখন দুই ইঞ্চি শিখে ফেলবে, তখন আমাকেও দুই ইঞ্চি বেশি শিখে আবার তোমাদের ওপর দুই ইঞ্চি যেতে হবে। তার মানে বুঝেছ?"

ছেলেমেয়েরা মাথা নাড়ল। বলল, বোঝেনি।

"তার মানে, তোমাদের লেখাপড়া করে যতটুকু পরিশ্রম করতে হবে, আমাকেও সব সময় তার সমান না হলেও তার থেকে বেশি পরিশ্রম করতে হবে। সব সময় দুই ইঞ্চি ওপরে থাকতে হবে!"

রাফির কথাগুলো ছেলেমেয়েরা বেশ সহজেই গ্রহণ করল বলে মনে হলো। রাফি টেবিলে হেলান দিয়ে বলল, "কাজটা ঠিক হলো কি না, বুঝতে পারলাম না।"

ছেলেমেয়েরা জানতে চাইল, "কোন কাজটা, স্যার?"

"এই যে আমি বললাম, দুই ইঞ্চির কথা! এর ফল আমার জন্য খুব ডেঞ্জারাস হতে পারে।"

আমার বই.কম
amarboi.com

"কী ডেঞ্জারাস, স্যার?"

"আমার নাম হয়ে যেতে পারে দুই ইঞ্চি স্যার!"

সারা ক্লাস আবার একসঙ্গে হেসে ওঠে। রাফি হাসি থেমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর বলে, "আজ যেহেতু প্রথম দিন, আমি তাই কোয়ান্টাম মেকানিকস নিয়ে কিছু বলব না। শুধু কোয়ান্টাম মেকানিকস যাঁরা বের করেছেন, সেই বিজ্ঞানীদের নিয়ে কয়েকটা গল্প বলি। ঠিক আছে?"

সবাই মাথা নেড়ে রাজি হয়ে গেল। রাফি তখন আইনস্টাইনের গল্প বলল, নীল বোরের গল্প বলল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাকে লুকিয়ে সরিয়ে নেওয়ার সময় তার বিশাল মস্তিষ্ক নিয়ে কী সমস্যা হয়েছিল, তা বলল, শর্ডিংগারের গল্প বলল, ডিরাকের বিখ্যাত নিগেটিভ মাছের গল্প বলল এবং শেষ করল বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন বসুর গল্প দিয়ে। এগুলো তার প্রিয় গল্প, সে বলল আগ্রহ নিয়ে। সব মানুষেরই গল্প নিয়ে কৌতূহল থাকে, তাই পুরো ক্লাস গল্পগুলো শুনল মনোযোগ দিয়ে। যেখানে হাসার কথা, সেখানে তারা

হাসল; যেখানে ক্রুদ্ধ হওয়ার কথা, সেখানে তারা ক্রুদ্ধ হলো; আবার যেখানে ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার কথা, সেখানে তারা ছোট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বিকেলে রাফি তার অফিস ঘরে যখন কাগজপত্র বের করে গুছিয়ে রাখছিল, তখন দরজা খুলে কবির তার মাথা ঢোকাল। বলল, "চলো, চা খেয়ে আসি।"

"চা?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"টঙে।"

"চলো।"

অফিস ঘরে তালা মেরে রাফি বের হয়ে আসে। কবির বলল, "যখন আমরা ছাত্র ছিলাম, তখন এই টঙে চা খেতাম। মাস্টার হওয়ার পরও অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। এখন আমাদের দেখাদেখি অনেক টিচারই আসে, ছাত্ররা খুবই বিরক্ত হয়।"

আমার বই. কম
amarboi.com

"হওয়ারই কথা!"

করিডরের গোড়ায় বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে, সবাই তাদের সমবয়সী। রাফি তাদের মধ্যে সুহানা আর রানাকে চিনতে পারল। কবির অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "এ হচ্ছে রাফি। আমাদের ডিপার্টমেন্টে নতুন জয়েন করেছে।"

সুহানা রাফির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "রাফি, আজ তুমি ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের কী বলেছ?"

"কেন, কী হয়েছে?"

"তারা খুব ইমপ্রেসড।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে বুঝলে?"

সুহানা হাসল। বলল, "আমাকে বলেছে।"

"কী বলেছে?"

"ছাত্রীরা বলেছে, তুমি নাকি খুব কিউট!"

রানা মুখভঙ্গি করে বলল, "হুম্! সাবধান রাফি। ছাত্রীরা যখন বলে কিউট, তখন সাবধানে থাকতে হয়।"

সবাই মিলে হেঁটে হেঁটে টঙের দিকে যেতে থাকে। পাশাপাশি অনেকগুলো টং। রানা খানিকটা ধারাবিবরণী দেওয়ার মতো করে বলল, "এই যে টংগুলো দেখছ, তার মধ্যে প্রথম যে টংটা দেখছ, সেখানে কখনো যাবে না।"

"কেন?"

"এটা যে চালায়, সে হচ্ছে জামাতি। এইখানে রড-কিরিচি এগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। যখন হল অ্যাটাক করে, তখন এখান থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়।"

"ইন্টারেস্টিং!"

"পরের টংগুলোতে যেতে পারো। সেকেন্ড টং খুব ভালো পেঁয়াজো ভাজে। থার্ড টঙের রং-চা ফার্স্ট ক্লাস। ফোর্থ টঙে গরম জিলাপি পাবে। আমরা সাধারণত এই জিলাপি খেতে যাই। তুমি জিলাপি খাও তো?"

"হ্যাঁ, খাই।"

কম বয়সী লেকচারাররা দল বেঁধে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেসব ছাত্রছাত্রী সেখানে বসেছিল, তারা উঠে একটু পেছনে সরে গেল। যে মানুষটি জিলাপি ভাজছে, সে গলা উঁচিয়ে বলল, "এই শারমিন, স্যারদের বেঞ্চ মুছে দে।"

বেঞ্চগুলো মোছার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু এটি এক ধরনের তোষামোদ। শারমিন নামের মেয়েটি একটা ন্যাকড়া দিয়ে বেঞ্চগুলো মুছে দিল। মেয়েটির বয়স বারো কিংবা তেরো—মায়াকাড়া চেহারা, এই বয়সে মেয়েদের চেহারায় এক ধরনের লাবণ্য আসতে শুরু করে।

কম বয়সী লেকচারাররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে, প্লেটে করে গরম জিলাপি আনা হয়। সবাই খেতে খেতে গল্প করে।

হঠাৎ রানা বলে, "ওই যে সমীর যাচ্ছে। ডাকো সমীরকে।" একজন গলা উঁচিয়ে ডাকল, "সমীর! জিলাপি খেয়ে যাও।"

সমীর অন্যদের সমবয়সী, উশকোখুশকো চুল এবং মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রানা গলা নামিয়ে বলল, "সমীর হচ্ছে আমাদের মধ্যে হার্ডকোর সায়েন্টিস্ট। বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের। ভাইরাস আর ব্যাক্টেরিয়া ছাড়া কোনো কথা বলে না।"

রানার কথা সত্যি প্রমাণ করার জন্যই কি না কে জানে, সমীর এসেই বলল, "তোরা আজকের খবরের কাগজ দেখেছিস?"

আমার বই . কম
amarboi.com

রানা জানতে চাইল, "কেন, কী হয়েছে?"

"খুব বাজে একটা ভাইরাস ডিটেক্ট করেছে। ইনফ্যাক্ট, এটা ভাইরাস না প্রিওন, তা এখনো সিওর না।"

"প্রিওনটা কী জিনিস?"

কবির বলল, "থাক থাক! এখন প্রিওন-ফ্রিওনের কথা থাক। জিলাপি খা। গরম জিলাপি খেলে সব ভাইরাস শেষ হয়ে যাবে।"

"ঠাট্টা নয়, খুব ডেঞ্জারাস।"

সমীর খুব গম্ভীর মুখে বলল, "সরাসরি ব্রেনকে অ্যাফেক্ট করে। আমাদের দেশের জন্য ব্যাড নিউজ।"

"কেন, আমাদের দেশের জন্য ব্যাড নিউজ কেন?"

"কোনো রকম প্রটেকশন নেই। কোনোভাবে ইনফেক্টেড একজন আসতে পারলেই এপিডেমিক শুরু হয়ে যাবে।"

কবির বলল, "থাক থাক, পৃথিবীর সব ভাইরাসের জন্য তোর দুশ্চিন্তা করতে হবে না, অন্যদেরও একটু দুশ্চিন্তা করতে দে। তুই জিলাপি খা।"

সমীর খুব দুশ্চিন্তিত মুখে জিলাপি খেতে থাকে। সবাই উঠে পড়ার সময় কবির জিলাপি তৈরি করতে থাকা মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কত হয়েছে?"

amarboi.com

মানুষটা কিছু বলার আগেই শারমিন নামের মেয়েটি বলল, "একেক জনের তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

সুহানা জিজ্ঞেস করল, "সব মিলিয়ে কত?"

"চুরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।"

"আমি দিয়ে দিচ্ছি।"

কবির বলল, "তুই কেন দিবি?"

"আজ আমাদের নতুন কলিগ এসেছে, তার সম্মানে।"

রানা বলল, "আর আমরা এত দিন থেকে আছি, আমাদের কোনো সম্মান নেই?"

"সম্মান দেখানোর মতো এখনো কোনো কারণ খুঁজে পাইনি!" সুহানা তার ব্যাগ থেকে এক শ টাকার একটা নোট বের করে শারমিনের হাতে দিয়ে বলল, "নাও। বাকিটা তোমার।" মেয়েটির মুখে একটা হাসি ফুটে ওঠে।

সবাই মিলে যখন ওরা হেঁটে হেঁটে ফিরে যাচ্ছে, তখন সুহানা রাফিকে বলল, "শারমিন মেয়েটাকে দেখেছ?"

"হ্যাঁ। কী হয়েছে?"

"কত বিল হয়েছে জানতে চাইলেই সে একটা আজগুবি সংখ্যা বলে দেয়। কেন বলে, কে জানে!"

রাফি অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল। টঙের কাছে গাছের ওপর একটা কাগজে জিলাপি, সিঙাড়া, বিস্কুট এবং চায়ের দাম লেখা আছে। সে ভেবেছিল, বিলটা দিয়ে দেবে, তাই মনে মনে হিসাব করছিল, কত হয়েছে। সবাই মিলে যা খেয়েছে, সেটা হিসাব করলে সত্যিই চুরানব্বই টাকা পঞ্চাশ পয়সা হয়। সাতজনের মধ্যে ভাগ করলে সেটা আসলেই মাথাপিছু তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা হয়। শারমিন আজগুবি কিছু বলেনি, নিখুঁত হিসাব করেছে।

রাফি তখনো জানত না, এই বাচ্চা মেয়েটির কারণে আর কিছুদিনের মধ্যেই তার জীবনের সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটবে।

আমার বই . কম
amarboi.com

২.

নুরুল ইসলাম টেবিলে বল পয়েন্ট কলমটা অন্যমনস্কভাবে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, "ঈশিতা।"

বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলের অন্য পাশে বসে থাকা ঈশিতা বলল, "বলেন।"

"বিকেলটা ফ্রি রেখো।"

"কেন?"

আমার বই . কম
amarboi.com

"তোমাকে এনডেভারের অফিসে যেতে হবে।"

"আমাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

নুরুল ইসলাম দেশের জনপ্রিয় একটা পত্রিকার সম্পাদক, পত্রিকা কীভাবে চালাতে হয়, সেটা খুব ভালো জানেন কি না, সেটা নিয়ে অনেকে প্রশ্ন করতে পারে কিন্তু ব্যবসা জানেন কি না, সেটা নিয়ে কেউ সন্দেহ করে না। টেলিফোন কোম্পানির ওপর কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বের হওয়ার পর থেকে কোম্পানিগুলো তার পত্রিকায় নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেয়। কৃতজ্ঞতাবশত, নুরুল ইসলামও তাঁর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বন্ধ রেখেছেন। এ মুহূর্তে তাঁর পত্রিকায় ব্যাংকগুলো নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বের হচ্ছে। তিনি ব্যাংকের জিএমদের কাছ থেকে ফোন পেতে শুরু করেছেন, মনে হচ্ছে তাঁদের থেকেও নিয়মিত বিজ্ঞাপন আসতে থাকবে। নুরুল ইসলাম ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এনডেভারের সিইওর একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে।"

ঈশিতা বলল, "সেটা বুঝেছি, কিন্তু আমি কেন? আরও সিনিয়র রিপোর্টাররা আছেন।"

"তিনটা কারণ। প্রথম কারণ হচ্ছে, তুমি ভালো ইংরেজি জান। শুদ্ধ বিদেশি অ্যাকসেন্টে ইংরেজি বলতে পার। বিদেশিদের ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য এ রকম রিপোর্টার দরকার। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, এনডেভার একটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি। তাদের কী প্রশ্ন করতে হয়, সেগুলো সিনিয়র সাংবাদিকেরা জানে না, তোমরা জান। তৃতীয় কারণটা বলা যাবে না। যদি বলি, তাহলে নারীবাদী সংগঠনগুলো আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।"

ঈশিতা হেসে ফেলল, "তার মানে তিনটা কারণের মধ্যে তৃতীয় কারণটাই ইম্পরট্যান্ট! অন্যগুলো এমনি এমনি বলেছেন। তাই না?"

"সবগুলোই ইম্পরট্যান্ট।" নুরুল ইসলাম হাসার ভঙ্গি করে বললেন, "এনডেভার দেশে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। পৃথিবীর একটা জায়ান্ট কম্পিউটার কোম্পানি। কাজেই যত্ন করে ওদের ইন্টারভিউ নেবে।"

"যত্ন করে?"

আমার বই . কম
amarboi.com

"হ্যাঁ। মানে বুঝেছ তো? ঘাঁটাবে না। এরা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিশাল মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। একটা সময় ছিল, যখন এসব কোম্পানিকে গালাগাল করা ছিল ফ্যাশন। এখন হচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। এখন এদের তোষামোদ করা হচ্ছে ফ্যাশন!"

"তার মানে এদের তোষামোদ করে আসব?"

"না। আমি সেটা বলছি না। তোষামোদ করবে না, কিন্তু কথা বলবে একটা পজিটিভ ভঙ্গিতে। এদের ঘাঁটাবে না, বিরক্ত করবে না। ওদের সঙ্গে পজিটিভ ভাবে কী বলা যায়, জেনে আসবে।"

"যদি পজিটিভ কিছু না পাই, তবুও—"

নুরুল ইসলাম আবার হাসির ভঙ্গি করলেন। বললেন, "আগে থেকে কেন সেটা ধরে নিচ্ছ, গিয়ে দেখো।"

ঈশিতা যখন নুরুল ইসলামের অফিস থেকে বের হয়ে যাচ্ছে, তখন তাকে বললেন, "আর শোনো, বিদেশিরা সময় নিয়ে খুবই খুঁতখুঁতে। পাঁচটায় সময় দিয়েছে, তুমি ঠিক পাঁচটার সময় হাজির হবে, এক মিনিট আগেও না, এক মিনিট পরেও না। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"যারা পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে পারে, তারা এই দেশের একটা পত্রিকাকে অনেক টাকার বিজ্ঞাপন দিতে পারে!"

ঈশিতা নুরুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। খবরের কাগজ আসলে খবরের জন্য নয়, খবরের কাগজ এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সেটা নিয়ে একসময় তর্কবিতর্ক করা যেত, ইদানীং সেটাও করা যায় না।

নুরুল ইসলামের কথামতো কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময় ঈশিতা এনডেভারের অফিসে এসে হাজির হয়েছে। কাজটা খুব সহজ হয়নি, ট্রাফিক জ্যামের কারণে কেউ আজকাল ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় যেতে পারে না। ঈশিতা মোটরসাইকেল চালিয়ে যায় বলে সে মোটামুটি ঠিক সময়ে পৌঁছে যেতে পারে, তার পরও আজ সে ঝুঁকি নেয়নি। অনেক আগে রওনা দিয়ে অনেক আগে পৌঁছে গেছে। বাড়তি সময়টা কাটাতে তার রীতিমতো কষ্ট হয়েছে। মোটরসাইকেলে ঘোরাফেরা করা শার্টপ্যান্ট পরে থাকা মেয়েদের নিয়ে সবারই এক ধরনের কৌতূহল। দামি ক্যামেরাটা থাকায় একটু সুবিধে, সাংবাদিক হিসেবে মেনে নেয়। প্রয়োজন না থাকলেও সে এদিক-সেদিক তাকিয়ে খ্যাচ-খ্যাচ করে ছবি তুলে নেয়, লোকজন তখন তাকে একটু সমীহ করে। ডিজিটাল ক্যামেরা, আজকাল ছবি তুলতে এক পয়সাও খরচ হয় না।

ঈশিতা অবশ্যি তার এত দামি ক্যামেরাটা নিয়ে ভেতরে যেতে পারল না, গেটের সিকিউরিটির মানুষটি একটা টোকেন দিয়ে ক্যামেরাটা রেখে দিল, যাওয়ার সময় ফেরত দেবে। ঈশিতাকে বলল, এনডেভারের অফিসের ভেতরে ক্যামেরা নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই। ক্যামেরাটা প্রায় জোর করে রেখে দেওয়ার সময়ই ঈশিতার মেজাজটা একটু খিঁচে ছিল, ভেতরে গিয়ে ওয়েটিং রুমে যখন টানা কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করতে হলো, তখন তার মেজাজ আরও একটু খারাপ হলো। শেষ পর্যন্ত যখন তার অফিসের ভেতর ডাক পড়েছে, তখন সে ভেতরে ভেতরে তেতে আছে। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে সে অবশ্যি বেশ অবাক হয়ে যায়—অফিস বলতেই যে রকম চোখের সামনে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদি আঁটা চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, কম্পিউটারের ছবি ভেসে ওঠে, এখানে সে রকম কিছু নেই। চৌদ্দতলায় এক পাশে ছাদ থেকে মেঝে পর্যন্ত কাচের দেয়াল দিয়ে বহু দূর দেখা যায়। ঈশিতা একটু অবাক হয়ে

লক্ষ করল, যদিও এলাকাটি শহরের মোটামুটি দরিদ্র এলাকা কিন্তু এত ওপর থেকে দেখলে সেটি বোঝা যায় না। এই দেশে অনেক গাছ, মনে হয় গভীর মমতায় সেই গাছগুলো দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখে। ঘরের অন্যপাশে দেয়ালে সারি সারি ফ্ল্যাট স্ক্রিন টিভি। এক ঘরে এতগুলো টিভি কেন, কে জানে। প্রত্যেকটা টিভিতেই নিঃশব্দে কিছু একটা চলছে। মেঝেটিতে ধবধবে সাদা টাইল এবং কুচকুচে কালো কিছু ফার্নিচার। যে ইন্টেরিওর ডেকোরেটর ঘরটিকে সাজিয়েছে, তার রুচিবোধ আধুনিক এবং তীব্র।

কাচের দেয়ালের সামনে একজন বিদেশি মানুষ দাঁড়িয়েছিল, ঈশিতার পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল এবং এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "ঈশিটা?"

ঈশিতা ইংরেজিতে বলল, "আসলে ঈশিতা। কিন্তু তুমি যেহেতু "ত" এবং "ট" আলাদাভাবে শুনতে পাও না বা উচ্চারণ করতে পার না, এতেই চলে যাবে।"

মানুষটা কেমন যেন অবাক হলো, শুধু অবাক নয়, মনে হলো কেমন যেন একটু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। কেউ তার ভুল ধরিয়ে দেবে, সে মনে হয় এই ব্যাপারটায় অভ্যস্ত নয়। বলল, "তুমি বলতে চাইছ "ট" উচ্চারণটি দুই রকম? কী আশ্চর্য! আমি এত দিন এই দেশে আছি, কেউ আমাকে এটা বলেনি!"

আমার বই . কম
amarboi.com

ঈশিতা বলল, "প্রয়োজন হয়নি। কিংবা তোমার মুখে এই উচ্চারণটিই হয়তো সবাই পছন্দ করে।"

মানুষটা ঈশিতাকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসায়। চেয়ারের সামনে একটি টেবিল, টেবিলের অন্য পাশে আরেকটি চেয়ারে বসে বলল, "বলো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?"

ঈশিতা বলল, "বব লাস্কি, আমাকে পাঠানো হয়েছে, তোমার একটি ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। তোমরা এই দেশে পাঁচ বিলিয়ন ডলার ইনভেস্ট করতে যাচ্ছ। কাজেই আমরা তোমাদের মুখ থেকে কিছু শুনতে চাই।"

বব লাস্কি চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "আমরা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার। সাদা ভাষায় তোমরা কম্পিউটার বলতে যা বোঝাও, সেই কম্পিউটার না। আমরা বিশেষ কাজ মাথায় রেখে কম্পিউটার তৈরি করি। এক ধরনের সুপার কম্পিউটার। আর্কিটেকচার সম্পূর্ণ আলাদা, নিউরাল নেটওয়ার্ক—"

ঈশিতা ইতস্তত করে বব লাস্কিকে থামিয়ে বলল, "আমি গত বিশ মিনিট তোমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ডেস্কে রাখা কাগজপত্র থেকে এগুলো জেনে গেছি। আমি আসলে তোমার কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু জানতে চাই।"

বব লাস্কির মুখ কঠিন হয়ে উঠল, ঈশিতা মোটামুটি স্পষ্ট ভাষায় তাকে জানিয়ে দিয়েছে, তুমি আমাকে বাইরে বিশ মিনিট অপেক্ষা করিয়েছ। এই মানুষটি এটিও পছন্দ করেনি, স্বাভাবিক ভদ্রতা দাবি করে এখন সে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করবে। বব লাস্কি দুঃখ প্রকাশ করল না। বলল, "তুমি আমার কাছে সুনির্দিষ্ট কী জানতে চাও?"

"বাংলাদেশে কেন?"

বব লাস্কি সরু চোখে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার ব্যবহার করে বিশেষ ধরনের কাজ করার উপযোগী সুপার কম্পিউটার তৈরি করার জন্য বাংলাদেশ যে সঠিক দেশ নয়, সেটা বোঝার জন্য খুব বেশি চালাক-চতুর হতে হয় না। কাজেই ঈশিতার প্রশ্নটা এমন কোনো দুর্বোধ্য প্রশ্ন ছিল না। কিন্তু বব লাস্কি ভান করল, প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি। বলল, "আমি তোমার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"ট্রপিক্যাল ডিজিজ গবেষণার জন্য বাংলাদেশ চমৎকার একটি দেশ হতে পারে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং কিংবা নারীর ক্ষমতায়নের জন্যও এটা চমৎকার জায়গা। জাহাজশিল্প কিংবা ফুড প্রসেসিংও হতে পারে। কিন্তু সুপার কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং? বাংলাদেশে? কেন? কীভাবে?"

আমারবই.কম
amarboi.com

বব লাস্কি এবার খুব হিসাব করে কথার উত্তর দিল। বলল, "তোমার দেশে এক শ পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ, সারা পৃথিবীর সব মানুষের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। মানুষের বুদ্ধিমত্তা পৃথিবীতে সমানভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের দেশে অসংখ্য মেধাবী ছেলেমেয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে বের হওয়া এই ছেলেমেয়েগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে চাই। তাদের নিয়ে নিউরাল নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচারের বিশ্বমানের গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি করতে চাই।"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "আমিও ঠিক এটা ভেবেছিলাম। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"তোমরা এখানে আছ এক বছর থেকে বেশি সময়, রেকর্ড টাইমে চৌদ্দতলা এই বিশাল বিল্ডিং তৈরি করেছ, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই দেশের কোনো ছেলে বা মেয়েকে নিয়োগ দাওনি।"

বব লাস্কির মুখ হঠাৎ কঠিন হয়ে যায়, শীতল গলায় বলে, "নিয়োগ দেওয়ার সময় শেষ হয়ে যায়নি।"

"সম্ভবত।" ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "আমার আরেকটা প্রশ্ন। তোমাদের এই বিশাল বিল্ডিংটা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারের ল্যাবরেটরির মতো না। এটা অনেকটা হাসপাতালের মতো। কারণ কী?"

"তুমি কেমন করে জান? সিকিউরিটির কারণে বাইরের কেউ এখানে ঢুকতে পারে না। তোমাকেও নিশ্চয়ই ঢুকতে দেওয়া হয়নি। একটা বিল্ডিংকে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কথা নয়, এটা হাসপাতাল, না ক্যাসিনো! তোমার কেন ধারণা হলো, এটা হাসপাতালের মতো?"

ঈশিতা বলল, "আমাকে যখন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়, তখন সেখানে যাওয়ার আগে আমি খুব ভালো করে হোমওয়ার্ক করে আসার চেষ্টা করি। এবার সময় বেশি পাইনি, তাই হোমওয়ার্কটা শেষ করতে পারিনি, যেটুকু পেরেছি, তাতে মনে হয়েছে—"

বব লাস্কি মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তোমার হোমওয়ার্ক ঠিক হয়নি, ভুল হয়েছে।"

"অসম্পূর্ণ বলতে পার, কিন্তু ভুল বলাটা ঠিক হবে না। আমি কীভাবে হোমওয়ার্কটা করার চেষ্টা করেছি, শুনলেই তুমি বুঝতে পারবে।"

আমার বই. কম
amarboi.com

"কীভাবে করেছ?"

"যে কন্ট্রাক্টর তোমার বিল্ডিংটা তৈরি করেছে, তার সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, এই বিল্ডিংয়ের একটা ফিচার হচ্ছে অক্সিজেনের লাইন। শুধু হাসপাতালে ঘরে ঘরে অক্সিজেন সাপ্লাই দিতে হয়! সে জন্য অনুমান করেছি—"

"তোমার অনুমান ভুল।" বব লাস্কি অনেক চেষ্টা করেও তার গলার স্বরে ক্রোধটাকে লুকিয়ে রাখতে পারল না, হিংস্র গলায় বলল, "কন্ট্রাক্টরের এসব কথা বলা হচ্ছে সম্পূর্ণ অনুচিত এবং বেআইনি। আমাদের দেশ হলে সে পুরোপুরি ফেঁসে যেত।"

ঈশিতা বব লাস্কির মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা পুরোপুরি উপভোগ করতে শুরু করে। মুখের হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত করে বলল, "শুধু কন্ট্রাক্টর নয়, কাস্টমসে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, তোমাদের এই বিল্ডিংয়ে কনটেইনার বোঝাই মেডিকেল ইকুইপমেন্ট আসছে। দামি দামি ইকুইপমেন্ট। এই দেশের সবচেয়ে বড় হাসপাতালও যে ইকুইপমেন্ট

আনার কথা চিন্তাও করতে পারে না, তোমরা সেই ইকুইপমেন্ট নিয়ে এসেছ। কেন?"

বব লাস্কি অনেকক্ষণ শীতল চোখে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি তোমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বাধ্য নই। তুমি আমার কাছে যে বিষয়গুলো জানতে চাইছ, সেই জিনিসগুলো তোমার জিজ্ঞাসা করার কথা নয়। পৃথিবীর যেকোনো সভ্য দেশ হলে—"

ঈশিতার মাথায় রক্ত উঠে গেল, অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করে বলল, "সভ্যতার কথা থাক। আমি তোমার সঙ্গে সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি। সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করতে হলে আমি কখনোই একজন আমেরিকান কম্পিউটার বিক্রেতার কাছে যাব না। অন্য কোথাও যাব।"

ঈশিতা বুঝে গেল, এটি হচ্ছে বেল্টের নিচে আঘাত। এই আঘাতের পর ইন্টারভিউ চলার কথা নয়; এবং সত্যি সত্যি আর চলল না। বব লাস্কি উঠে দাঁড়াল। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, তুমি এখন বিদায় হও।

ঈশিতাও উঠে দাঁড়াল। টেবিল থেকে কাগজগুলো তুলতে তুলতে বলল, "বাংলাদেশে গত কিছুদিনে অসাধারণ দুটি ব্যাপার ঘটেছে, একটা হচ্ছে তথ্য অধিকার আইন। এই দেশে এখন সরকার যেকোনো তথ্য দিতে বাধ্য। আমাদের মতো সাংবাদিকদের ভারি মজা। এখন পুলিশ বলো, কাস্টমস বলো, সবার কাছ থেকে খবর বের করতে পারি। দ্বিতীয়টা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। না বুঝে এই দেশের মানুষ এখন ভয়ংকর ভয়ংকর খবর ইন্টারনেটে দিয়ে রাখে!"

বব লাস্কি কিছু বলল না। ঈশিতা হেঁটে বের হয়ে যেতে যেতে বলল, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার কেন ডিভোর্স হয়েছে, সেটাও—"

বব লাস্কি চিৎকার করে বলল, "তুমি কেমন করে জান?"

"জানতাম না। এখন জানলাম।" ঈশিতা মিষ্টি করে হাসে, "সাংবাদিকেরা অনেক অপ্রয়োজনীয় তথ্য জানে। শুধু শুধু!"

মোটরসাইকেলটা চালিয়ে ঈশিতা যখন তার অফিসে ফিরে আসছে, তখন সে বুঝতে পারল, কাজটা ভালো হলো না। সম্পাদক নুরুল ইসলাম বারবার করে বলে দিয়েছেন, এদের ঘাঁটাবে না, বিরক্ত করবে না। দরকার হলে তোষামোদ করবে। অথচ সে ঠিক উল্টো কাজটা করে এসেছে। বব লাস্কিকে ঘাঁটিয়েছে, বিরক্ত করেছে, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করেছে, ভয় দেখিয়েছে,

আমার বই.কম
amarboi.com

অপমান করেছে। শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে টিটকারি মেরেছে। সে এইটুকুন পুচকে একটা মেয়ে, কেন তার মাথায় এ রকম দুর্বুদ্ধি হলো? চাকরিটা মনে হয় গেল।

রাত এগারোটার সময় ঈশিতা নুরুল ইসলামের টেলিফোন পেল। তিনি হিমশীতল গলায় বললেন, "ঈশিতা, তুমি কোথায়?"

ঈশিতা মেয়েদের একটা হোস্টেলে থাকে। সে বলল, "হোস্টেলে।"

"হোস্টেলটা কোথায়?"

"মণিপুরী পাড়ায়।"

"তোমার একটু অফিসে আসতে হবে।"

ঈশিতা একটু অবাক হয়ে বলল, "এখন?"

"কেন? সমস্যা আছে?"

"না, নেই।"

"গাড়ি পাঠাব?"

ঈশিতা বলল, "না, গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি আসছি। পনেরো মিনিটে পৌঁছে যাব।"

ঈশিতা টেলিফোন রেখে দিচ্ছিল। তখন নুরুল ইসলাম বললেন, "আর শোনো—"

"বলুন।"

"আজকের অ্যাসাইনমেন্টের কাজ কোথায় করছ?"

"আমার ল্যাপটপে।"

"ল্যাপটপটা নিয়ে এসো। যদি কোনো কাগজে নোট নিয়ে থাক, তাহলে কাগজগুলোও নিয়ে এসো। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

রাত এগারোটায় রাস্তাঘাট ফাঁকা, ঈশিতা কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মোটরসাইকেলে খবরের কাগজের অফিসে পৌঁছে গেল। পনেরো মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যেত, কয়েক মিনিট দেরি হলো। সে মেয়েদের যে হোস্টেলে থাকে, তার কিছু নিয়মকানুন আছে। এত রাতে কেন বের হচ্ছে, সেগুলো দারোয়ান আর সুপারকে বোঝাতে তার কিছু বাড়তি সময় লেগেছে।

খবরের কাগজের অফিস ভোরবেলা ঢিলেঢালাভাবে শুরু হয়, রাতের দিকে সেটা রীতিমতো জমজমাট থাকে। রাত গভীর হওয়ার পর সেটা

আমার বই . কম
amarboi.com

আবার ফাঁকা হতে শুরু করে। ঈশিতা যখন অফিসে পৌছেছে, তখন সেটা ফাঁকা হতে শুরু করেছে। নুরুল ইসলামের অফিস তিনতলায়, লিফটে করে উঠে করিডর ধরে তার অফিসে যেতে যেতে সে দেখতে পেল, তার অফিসে দুজন মানুষ বসে আছে।

দরজা খুলে মাথা ঢুকিয়ে ঈশিতা বলল, "আসব?"

"এসো।" নুরুল ইসলাম একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, "বসো।"

ঈশিতা ল্যাপটপটা টেবিলে রেখে চেয়ারটায় বসে। সাধারণ সামাজিক নিয়মে এখন নুরুল ইসলামের এই দুজন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন না, চুপচাপ বসে রইলেন। মানুষ দুজন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। একজন মধ্যবয়স্ক, অন্যজনের বয়স একটু কম। দুজনেই হাস্যকর এক ধরনের সাফারি কোট পরে আছে। এই পোশাকটি কে আবিষ্কার করেছে, আর বাংলাদেশের মানুষ কেন এটি পরে, বিষয়টি ঈশিতা কখনোই ভালো করে বুঝতে পারেনি। মানুষ দুজনের চুল ছোট করে ছাঁটা, পেটা শরীর, মুখে এক ধরনের কাঠিন্য।

ঈশিতা কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে নুরুল ইসলামের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে ডেকেছেন?"

আমার বই . কম
amarboi.com

মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "আসলে আমরা ডাকিয়েছি।"

ঈশিতা এবার ঘুরে মানুষটির দিকে তাকাল। মানুষটি বলল, "বাংলাদেশে কত দিন থেকে ক্রসফায়ারে মানুষ মারা হচ্ছে, আপনি জানেন?"

ঈশিতা প্রশ্নটা শুনে চমকে উঠল। ইতস্তত করে বলল, "সব মিলিয়ে বছর দশেক হবে।"

"কত মানুষকে মারা হয়েছে?"

"কয়েক হাজার।"

"আমাদের সংবিধান কি এই মার্ডারকে অ্যালাও করে?"

"না।"

"এটা নিয়ে কি পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে? হিউম্যান রাইটস গ্রুপ কি চেঁচামেচি করেছে?

"হ্যাঁ, করেছে।"

"কোনো লাভ হয়েছে?"

ঈশিতা বলল, "না, হয়নি।"

"তার মানে কি আপনি জানেন?"

ঈশিতা দুর্বল গলায় বলল, "না, জানি না।"

"তার মানে হচ্ছে, পৃথিবীর সব দেশে দেশের আইন মানার প্রয়োজন হয় না, সে রকম একটা বাহিনী থাকে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তারা দ্রুত ডিসিশন নিতে পারে। দ্রুত সেই ডিসিশন কার্যকর করতে পারে।"

"মানে মানুষ মার্ডার করতে পারে?"

"আরও অনেক কিছু করতে পারে।"

ঈশিতা জিব দিয়ে তার শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে বলল, "আপনারা গভীর রাতে ডেকে এনে আমাকে এসব বলছেন কেন? আপনারা কারা?"

মানুষটা এবার ঈশিতার দিকে তাকিয়ে হাসার মতো ভঙ্গি করল এবং ঈশিতা তখন বুঝতে পারল, এই মানুষটি আসলে ভয়ংকর একটি মানুষ। মানুষটি তার কালচে জিবটা বের করে ওপরের ঠোঁটটা চেটে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "শোনো মেয়ে, এখন আসল কথায় চলে আসি।" মানুষটি এতক্ষণ আপনি করে কথা বলছিল, এখন তুমিতে নেমে এসেছে—"আমাদের কেউ প্রশ্ন করে না, দরকার হলে আমরা প্রশ্ন করি। বুঝেছ?"

আমার বই . কম

ঈশিতা কথা না বলে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটি বলল, "কাজেই আমি কে, কী করি, কেন এসেছি, জানতে চেয়ো না। ঠিক আছে?"

ঈশিতা মাথা নাড়ল, "না, ঠিক নেই।"

মানুষটা এবার শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, "বিষয়টা ঠিক আছে কি নেই, সেটা তুমি খুব সহজে পরীক্ষা করে দেখতে পার। তুমি যদি চাও, আমরা তোমাকে এখন তুলে নেব, ভোর রাতে মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে ফেলে যাব। একটু সুস্থ হয়ে তুমি পুলিশে কেস করার চেষ্টা করবে। তুমি দেখবে যে পুলিশ তোমার কেস নিচ্ছে না। খুব বেশি হলে পত্রপত্রিকায় একটু লেখালেখি করাতে পারবে কিন্তু দেখবে তার পরও কিছুই করতে পারবে না। চ্যালেঞ্জটা নিতে চাও?"

ঈশিতা মাথা নেড়ে জানাল, সে নিতে চায় না।

মানুষটা বলল, "গুড।" টেবিলে ল্যাপটপটা দেখিলে বলল, "এটা তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"এনডেভারের ওপর যে রিপোর্টটা লিখছ, সেটা এখানে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"কাগজগুলো?"

"এই ব্যাগটাতেই আছে।"

"গুড।" মানুষটি ব্যাগসহ ল্যাপটপটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে বলল, "আমি এটা নিতে এসেছি।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "নিতে এসেছেন? আমার ল্যাপটপ?"

"হ্যাঁ। তোমার এডিটর সাহেবকে বলব দরকার হলে তোমাকে আরেকটা ল্যাপটপ কিনে দিতে।"

মানুষ দুজন উঠে দাঁড়াল, দরজার দিকে হেঁটে যেতে যেতে মধ্যবয়স্ক মানুষটি দাঁড়িয়ে যায়। ঘুরে নুরুল ইসলাম আর ঈশিতা দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরও একটা কথা। এনডেভার নিয়ে যদি তোমরা বিন্দুমাত্র কৌতূহল দেখাও, তাহলে"—কথা শেষ না করে সে হাত দিয়ে গলায় পোচ দেওয়ার ভঙ্গি করল।

মানুষ দুজন ভারী জুতোর শব্দ তুলে করিডর ধরে হেঁটে চলে গেল। লোকগুলো চোখের আড়াল হওয়ার পর ঈশিতা হতবাক হয়ে বলল, "মগের মুল্লুক? আমার ল্যাপটপটা নিয়ে চলে গেল?"

আমারবই.কম
amarboi.com

নুরুল ইসলাম নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "ল্যাপটপ! শোনো ঈশিতা, খুব অল্পের ওপর দিয়ে গিয়েছে।"

"অল্পের ওপর দিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"এরা কারা?"

নুরুল ইসলাম ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "জিজ্ঞেস কোরো না।"

"এনডেভারের সঙ্গে এদের কী সম্পর্ক।"

"এনডেভারের নাম মুখেও আনবে না।"

ঈশিতা ইতস্তত করে বলল, "আজকে এনডেভারের সঙ্গে আমার কী কথা হয়েছে, আপনি শুনতে চান?"

নুরুল ইসলামের মুখে আতঙ্ক এসে ভর করল, "না, শুনতে চাই না। এনভেডার নিয়ে কী লিখতে হবে, তার একটা রিপোর্ট দিয়ে গেছে।"

"সেটা কোথায়?"

নুরুল ইসলাম টেবিলের ওপর থেকে একটি কাগজ হাতে নিয়ে তার দিকে এগিয়ে দিলেন। ঈশিতা কয়েক লাইন পড়ে নুরুল ইসলামের কাছে

ফিরিয়ে দিল। বিশ্বের সেরা কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারার বাংলাদেশের প্রতিভাবান তরুণদের সমন্বয়ে কীভাবে ভবিষ্যতের নিউরাল কম্পিউটার গড়ে তুলবে, তার আকর্ষণীয় একটি বর্ণনা আছে। একটি বড় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের কী ধরনের সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে এবং সেই দায়বদ্ধতার কারণে তারা এই দেশের দুস্থ শিশুদের স্বাস্থ্যশিক্ষা আর সামাজিক নিরাপত্তার জন্য কী কী কাজ করেছে, তার একটি বিশাল বর্ণনা আছে। ঠিক কী কারণ, জানা নেই। ঈশিতা তার একটি কথাও বিশ্বাস করল না।

গভীর রাতে ঈশিতা যখন অফিস থেকে বের হয়ে নিজের মোটরসাইকেলে উঠেছে, সে টের পেল দূরে একটি গাড়ির হেড লাইট জ্বলে উঠেছে। যখন রাস্তায় নেমেছে, তখন দেখতে পেল, গাড়িটি একটি দূরত্ব রেখে তার পেছনে পেছনে আসছে।

গাড়িটা কিছুই করল না। শুধু তার পেছনে পেছনে হোস্টেল পর্যন্ত এল, যখন সে ভেতরে ঢুকে গেল, গাড়িটা কিছুক্ষণ বাসার সামনে অপেক্ষা করে চলে গেল।

এরা কারা, ঈশিতা জানে না। কিন্তু এদের কাজকর্মে কোনো গোপনীয়তা নেই, কোনো লুকোছাপা নেই। এরা কাউকে ভয় পায় না। এই দেশে তাদের জন্য কোনো আইন নেই।

আমার বই. কম
amarboi.com

৩.

টঙে বসে চা খেতে খেতে রাফি শারমিনকে লক্ষ করে। যারা চা খেতে আসছে, সে কাপে করে তাদের চা দিয়ে আসছে। প্লেটে করে শিঙাড়া, জিলাপি, বিস্কুট দিচ্ছে। চা খাওয়ার পর কাপ-পিরিচ নিয়ে আসছে, বিল দেওয়ার সময় হলে সে নিখুঁতভাবে কার কত টাকা বিল দিতে হবে, বলে দিচ্ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কার কত টাকা বিল হচ্ছে, সে কেমন করে মনে রাখছে, কে জানে।

রাফির কাপ-পিরিচ নেওয়ার সময় সে জিজ্ঞেস করল, "আমার কত বিল হয়েছে?"

আমার বই. কম
amarboi.com

শারমিন একটুও চিন্তা না করে বলল, "সতেরো টাকা।"

"ঠিক করে হিসাব করেছ?"

শারমিন লাজুক মুখে মাথা নাড়ল। শারমিনের বাবা একটি গ্যাসের স্টোভে কড়াইয়ে জিলাপি ভাজছিল, রাফির দিকে তাকিয়ে বলল, "শারমিন হিসাবে ভুল করে না।"

"ভেরি গুড।" রাফি পকেট থেকে একটি বিশ টাকার নোট বের করে শারমিনের হাতে দিয়ে বলল, "বাকিটা তোমার।"

মেয়েটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই দেশের মানুষ এখনো মুখ ফুটে ধন্যবাদ বলা শুরু করেনি। যখন ধন্যবাদ বলার কথা, তখন সেটা মুখের হাসি দিয়ে বোঝাতে হয়।

শারমিনের বাবা গরম জিলাপি কড়াই থেকে তুলে চিনির সিরায় ডুবাতে ডুবাতে বলল, "আমার শারমিন যেকোনো হিসাব মাথার মাঝে করে ফেলতে পারে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

রাফি শারমিনের দিকে তাকিলে বলল, "সত্যি পার?"

শারমিন ঘাড় নেড়ে জানাল, সে পারে। রাফি বলল, "বলো দেখি, সতেরোকে তেরো দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

শারমিন একটু হকচকিয়ে গেল, ইতস্তত করে বলল, "জানি না।"

"তাহলে যে বললে, সব হিসাব মাথার মাঝে করে ফেলতে পার?"

শারমিনের বাবা বলল, "আসলে আমার এই টঙে চা-নাশতার হিসাব করতে পারে। যোগ-বিয়োগ পারে না।"

রাফি একটু অবাক হয়ে বলল, "যোগ-বিয়োগ পারে না, কিন্তু চা-নাশতার হিসাব করতে পারে! ঠিক আছে, তাহলে চা-নাশতার হিসাবই করতে দিই।" রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "একটা বিস্কুট কত?"

শারমিন বলল, "এক টাকা।"

"সতেরোজন এসেছে বিস্কুট খেতে। একজন তেরোটা করে বিস্কুট খেয়েছে। কত টাকা বিল হবে, বলো?"

শারমিন কোনো চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলল, "দুই শ একুশ টাকা।"

আমার বই .কম
amarboi.com

রাফি মনে মনে হিসাব করে দেখল, ঠিকই বলেছে। শারমিন ঠিকই গুণ করতে পারে। কিন্তু গুণ বলতে কী বোঝায়, সে জানে না। রাফি জিজ্ঞেস করল, "যদি তেতাল্লিশজন লোক এসে সবাই তেতাল্লিশটা করে বিস্কুট খায়, তাহলে কত টাকার বিস্কুট খাবে?"

শারমিন বলল, "আঠারো শ উনপঞ্চাশ টাকা।"

রাফিকে এবার কাগজে লিখে হিসাব করে দেখতে হলো, শারমিন ঠিক বলেছে কি না। অনুমান করেছিল, সঠিক হবে এবং দেখা গেল সত্যিই সঠিক হয়েছে। রাফি এবার একটু অবাক হতে শুরু করেছে, মেয়েটি কত পর্যন্ত যেতে পারে, তার দেখার ইচ্ছে হলো। জিজ্ঞেস করল, "নয় শ বিরাশি জন এসে সবাই সাত শ একুশটি করে বিস্কুট খেয়েছে। বলো দেখি, কত টাকার বিস্কুট খেয়েছে?"

"সত্তুর শ শ আশি শ বাইশ টাকা।"

শারমিনের উত্তরটা বিচিত্র, রাফি আবার জিজ্ঞেস করল, "কী বললে?"

"সত্তুর শ শ, আশি শ বাইশ টাকা"

রাফি কথাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু তার পরও সে কাগজে লিখে ফেলল। তারপর নয় শ বিরাশিকে সাত শ একুশ দিয়ে গুণ করতে শুরু

করে। কয়েক মিনিট পর উত্তর বের হলো, সাত লাখ আট হাজার বাইশ। শারমিন সাত লাখকে বলে সত্তুর শ শ আর আট হাজারকে বলেছে আশি শ। অন্যরকমভাবে বলেছে কিন্তু ভুল বলেনি। রাফি অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিয়ে খিল খিল করে হাসছে। রাফি জিজ্ঞেস করল, "হাসো কেন?"

"কেউ যদি সাত শ একুশটা বিস্কুট খায়, তাহলে তার পেট ফেটে যাবে!"

শারমিনের কথা শুনে রাফিও হেসে ফেলল। শারমিন ভুল বলেনি, সাত শ একুশটা বিস্কুট খেলে সত্যিই পেট ফেটে যাওয়ারই কথা। এই মুহূর্তে রাফি অবশ্যি সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না। মেয়েটি কত পর্যন্ত হিসাব করতে পারে, সেটা সে দেখতে চাইল। বলল, "পেট ফাটলে ফাটুক, সেটা নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। তুমি আমাকে বলো, যদি দুই হাজার তিন শ বাইশ জন এসে সবাই সাত হাজার নয় শ আটচল্লিশটা করে বিস্কুট খায়, তাহলে কত টাকা বিল হবে?"

শারমিনকে একটু ইতস্তত করতে দেখা গেল, বলল, "দুই হাজার? হাজার মানে কী?"

রাফি বুঝতে পারল, মেয়েটি এর আগে কখনো হাজার কথাটি ব্যবহার করেনি। তার দৈনন্দিন হিসাব কখনোই কয়েক শয়ের বেশি যায় না। তাই সে হাজার শব্দটি ব্যবহার না করে জিজ্ঞেস করল, "তেইশ শ বাইশজন সবাই ঊনাশি শ আটচল্লিশটা করে বিস্কুট খেয়েছে, কত টাকা বিল?"

শারমিন এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল, "আঠারো শ শ শ পয়তাল্লিশ শ শ বাহান্ন শ ছাপ্পান্ন।"

রাফিকে এবারে তার পকেট থেকে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করে সেখানে ক্যালকুটরে হিসাব করে দেখতে হলো, শারমিন তার এক থেকে এক শ পর্যন্ত সংখ্যার জ্ঞান নিয়ে উত্তরটা নিখুঁতভাবে বলেছে। অবিশ্বাস্য। সে অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল, জিজ্ঞেস করল, "তুমি এইভাবে কত পর্যন্ত পার?"

"কত পর্যন্ত?" শারমিন ইতস্তত করে বলল, "যত পর্যন্ত দরকার।"

ঠিক আছে, "বলো দেখি, বত্রিশ হাজার চুয়ান্ন শ সাতষট্টিজন মানুষ এসে সবাই নয় হাজার আট শ তেরোটা করে বিস্কুট খেয়েছে" প্রশ্নটা শেষ করার আগেই তার মনে পড়ল, মেয়েটি হাজার শব্দটা জানে না। কাজেই হাজার শব্দটা ব্যবহার না করে কীভাবে বলা যায়, চিন্তা করছিল। তার আগেই

আমার বই কম
amarboi.com

শুনতে পেল শারমিন বলছে, "তিন হাজার হাজার হাজার এক শ তিরানব্বই হাজার হাজার আট শ পঁচানব্বই হাজার নয় শ আটাশি টাকা।"

রাফি ভুরু কুঁচকে বলল, "তুমি না এক্ষুনি বললে, হাজার জানো না?"

"এখন জানি।"

"কেমন করে জানলে?"

"এই যে আপনি প্রথমে বললেন, দুই হাজার তিন শ বাইশ, তারপর সেটাকে বললেন তেইশ শ বাইশ। তার মানে দশ শ হচ্ছে হাজার।"

রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটি শুধু যে মাথার মধ্যে গুণ করতে পারে, তা-ই নয়, নিজে নিজে শিখেও নিতে পারে। শারমিন যে সংখ্যাটা বলেছে, রাফি সেটা কাগজে লিখে নিল। তার মোবাইল টেলিফোনের ক্যালকুলেটরে সেটা সঠিকভাবে দেখাতে পারবে না। তার ক্যালকুলেটর নয় অঙ্কের বেশি দেখাতে পারে না। অন্যভাবে গুণটা করে দেখতে হবে, কিন্তু রাফির কোনো সন্দেহ রইল না যে সংখ্যাটি সঠিক। যে বিষয়টা বিস্ময়কর সেটা হচ্ছে, মাথার মধ্যে হিসাব করতে এই মেয়েটি এক মুহূর্তও সময় নিচ্ছে না। প্রত্যেকবারই সঠিকভাবে বলে দিচ্ছে।

রাফি শারমিনের হাত ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?" শারমিন কোনো কথা না বলে বিব্রতভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, প্রশ্নের উত্তর দিল তার বাবা। বলল, "লেখাপড়া করে না।"

আমার বই.কম
amarboi.com

রাফি হতবাক হয়ে বলল, "লেখাপড়া করে না?"

"না। আমি কম চেষ্টা করি নাই। করতে চায় না।"

রাফি হিসাব মেলাতে পারল না, যে মানুষ অবলীলায় যেকোনো সংখ্যার সঙ্গে অন্য যেকোনো সংখ্যা গুণ করে ফেলতে পারে, সে লেখাপড়া করতে চাইবে না কেন? রাফি শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি লেখাপড়া করতে চাও না?"

শারমিন কোনো কথা না বলে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রাফি লক্ষ করল, তার মুখে লজ্জা এবং বেদনার ছাপ। রাফি গলার স্বর নরম করে বলল, "করতে চাও না?"

শারমিন অস্পষ্ট স্বরে বলল, "চাই। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

এবারও রাফির প্রশ্নের উত্তর দিল শারমিনের বাবা। বলল, "ওর কথা আর বলবেন না। যখন পড়তে যায়, তখন নাকি বইয়ের লেখা উল্টা হয়ে যায়—তারপর নাকি নড়েচড়ে লাফায়, সে নাকি পড়তে পারে না।"

রাফি চোখ বড় বড় করে বলল, "ডিসলেক্সিয়া!"

শারমিন আর তার বাবা দুজনই রাফির দিকে তাকাল। বাবা ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন?"

"ডিসলেক্সিয়া। যাদের ডিসলেক্সিয়া থাকে, তাদের এ রকম হয়, লেখাপড়া করতে পারে না। পৃথিবীর অনেক বিখ্যাত মানুষ আছে, যারা খুবই স্মার্ট কিন্তু লেখাপড়া জানে না।"

শারমিন রাফির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই রোগের চিকিৎসা নাই?"

"এটা তো রোগ না, এটা হচ্ছে ব্রেনের এক ধরনের সমস্যা। বিদেশে বাচ্চাদের ডিসলেক্সিয়া থাকলে তাদের স্পেশাল স্কুল থাকে। আমাদের দেশে সেরকম কিছু নেই, বাবা-মা, মাস্টাররা মনে করে, বাচ্চাটা দুষ্টু, পড়ায় মনোযোগ নেই, বকাঝকা করে মারধর করে।"

শারমিন নিচু গলায় বলল, "স্কুলেও আমাকে অনেক মারত।"

শারমিনের বাবা অপরাধীর মতো বলল, "আমিও কত মেরেছি।"

রাফি বলল, "মারধর ইজ নো সলিউশন। শারমিনের কোনো দোষ নেই। বেচারি পারে না। ওর ডিসলেক্সিয়া।"

আমারবই.কম
amarboi.com

শারমিন রাফির কাছে এসে আবার জিজ্ঞেস করল, "বিদেশে এই রোগের চিকিৎসা আছে?"

মেয়েটির গলার স্বরে এক ধরনের ব্যাকুলতা। রাফির খুব মায়া হলো, নরম গলায় বলল, "এটা তো রোগ না, তাই এর চিকিৎসা নেই। কিন্তু যেহেতু এটা একটা সমস্যা, তাই এই সমস্যাটাকে বাইপাস করার উপায় নিশ্চয়ই বের করেছে। যারা অন্ধ, তারাও তো লেখাপড়া করে, তাহলে তুমি পারবে না কেন?"

শারমিন ফিসফিস করে, শোনা যায় না, এ রকম স্বরে বলল, "স্যার, আমার খুব লেখাপড়া করার ইচ্ছা।"

রাফি বলল, "নিশ্চয়ই তুমি লেখা পড়া করবে। আমি দেখব।"

রাফি টং থেকে উঠে আসার সময় লক্ষ করল, আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্রছাত্রীদের বেশ কয়েকজন শারমিনকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন উচ্চস্বরে জিজ্ঞেস করছে, "বল দেখি, তিন শ বাইশকে সাত শ নয় দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

রাফি হেঁটে চলে গেল বলে শারমিন কী বলল, সেটা ঠিক শুনতে পারল না। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে এই বাচ্চা মেয়েটির জন্য একটি সমস্যা হতে পারে।

দুই দিন পর রাফি সমস্যার মাত্রাটা টের পেল। নিজের অফিস ঘরে গভীর মনোযোগ দিয়ে ক্লাস লেকচার ঠিক করছে, তখন দরজায় একজন মানুষের ছায়া পড়েছে। রাফি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখে লুঙ্গি পরা আধবুড়ো একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। রাফি জিজ্ঞেস করল, "কে? আমার কাছে?"

"জি।"

"আসেন।"

মানুষটা কুণ্ঠিতভাবে ভেতরে এসে ঢোকে। রাফির কাছে মানুষটিকে চেনা চেনা মনে হয়, কিন্তু সে ঠিক চিনতে পারে না। তখন মানুষটি নিজেই পরিচয় দিল। বলল, "স্যার, আমি শারমিনের বাবা।"

"ও আচ্ছা! হ্যাঁ, বসেন।" রাফি নিজেই অবাক হয়ে যায়, সে কেমন করে শারমিনের বাবাকে চিনতে পারল না। এর আগেও এ রকম ব্যাপার ঘটেছে, যে মানুষটিকে যেখানে দেখার কথা, সেখানে দেখলে কখনোই চিনতে ভুল হয় না। কিন্তু যেখানে থাকার কথা না, সেখানে দেখলে চট করে চিনতে পারে না।

আমার বই . কম
amarboi.com

শারমিনের বাবা বসল না। কাঁচুমাচু মুখে বলল, "স্যার, বড় বিপদে পড়েছি।"

"কী বিপদ!"

"শারমিনকে নিয়ে বিপদ।"

রাফি ভুরু কুঁচকে বলল, "শারমিনকে নিয়ে?"

"জি স্যার।" বিপদটা কী সেটা না বলে মানুষটি বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

রাফি বলল, "বলেন, শুনি।"

শারমিনের বাবা একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "অনেক খুঁজে আপনার কাছে এসেছি। আপনি স্যার নতুন এসেছেন, সবাই চিনে না, সে জন্য খুঁজে বের করতে সময় লেগেছে।"

"হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি।"

"স্যার, মনে আছে, আপনি সেদিন শারমিনকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন? শারমিন তার উত্তর দিল।"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"তখন অনেক ছাত্রছাত্রী দাঁড়িয়েছিল, তারা ব্যাপারটা দেখেছে। এখন তারা শারমিনকে আর কোনো কাজ করতে দেয় না। বলতে গেলে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা তাকে জ্বালায়।"

"জ্বালায়?"

"জি স্যার।"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে জ্বালায়?"

"সারাক্ষণ তাকে জিজ্ঞেস করে, গুণ দিলে কত হয়, যোগ দিলে কত হয়—এসব। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে।"

রাফি একটু হাসল, বলল, "এইটা দুনিয়ার নিয়ম। যে যেটা পারে তাকে সবাই সেটা করতে বলে। যে গান গাইতে পারে তাকে সবাই গান গাইতে বলে। যে হাত দেখতে পারে তাকে দেখলে সবাই হাত বাড়িয়ে দেয়! শারমিনকে একটু সহ্য করতে হবে।"

"সেইটা সমস্যা না।"

রাফি একটু অবাক হয়ে বলল, "তাহলে কোনটা সমস্যা?"

শারমিনের বাবা একটু ইতস্তত করে বলল, "স্যার, আপনাকে কীভাবে বলি বুঝতে পারছি না। জানাজানি হলে আমার বিপদও হতে পারে—"

রাফির কাছে এবার ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হতে থাকে। সে মানুষটির দিকে খানিকটা বিস্ময় এবং অনেকখানি কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মানুষটি একবার মাথা চুলকালো, তারপর গাল চুলকালো, তারপর নিচু গলায় বলল, "স্যার, আমরা যে এই টংঘরগুলো চালাই সেই জন্য আমাদের নিয়মিত চাঁদা দিতে হয়।"

"চাঁদা? কাকে চাঁদা দিতে হয়?"

"ছাত্রনেতাদের। তারা এসে যখন খুশি ফাও খায়, আবার দৈনিক চাঁদা নেয়।"

"কী আশ্চর্য!"

"না স্যার, এর মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নাই। এইটাই নিয়ম, যখন যেই দল ক্ষমতায়, তখন সেই দলকে চাঁদা দিই। সেইটা সমস্যা না। সেইটা আমরা সবাই মেনে নিয়েছি।"

"তাহলে সমস্যাটা কী?"

আমার বই কম
amarboi.com

শারমিনের বাবা আরেকটু এগিয়ে এসে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বলল, "ক্যাম্পাসে এখন যে সবচেয়ে বড় ছাত্রনেতা, তার নাম হান্নান। অনেক বড় মাস্তান, সবাই ডাকে ভোটকা হান্নান।"

"কী করেছে ভোটকা হান্নান?"

"সেই দিন আমার টংয়ে এসে আমারে জিজ্ঞেস করে, এই, তোর মেয়ে নাকি অঙ্কের এক্সপার্ট। আমি বললাম, সেইটা তো জানি না, তাকে যোগ-বিয়োগ করতে দিলে করতে পারে। তখন ভোটকা হান্নান শারমিনকে টেস্ট করল। যেটাই গুণ দিতে বলে শারমিন করে দেয়। তখন, তখন—" মানুষটি হঠাৎ কথা বন্ধ করে থেমে গেল।

"তখন কী?"

"ভোটকা হান্নান এখন শারমিনরে তুলে নিতে চায়।"

"তুলে নিতে চায়?" রাফি তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল, "তুলে নিতে চায় মানে কী?"

"শারমিনরে নাকি ঢাকায় নিয়ে যাবে, টেলিভিশনে দেখাবে।" শারমিনের বাবা একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। বলল, "স্যার, আপনি যদি আমারে বলতেন শারমিনরে ঢাকায় টেলিভিশনে নিবেন, স্যার আমি তাহলে খুশি হয়ে রাজি হতাম। আপনি সেদিন মেয়েটারে বলেছেন, তাকে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। মেয়েটা কী খুশি! বাড়িতে গিয়ে তার মাকে কতবার সেই কথাটা বলেছে। স্যার, আপনাদের ওপর ভরসা করে আমরা থাকি। তাই বলে ভোটকা হান্নান? সে কেন আমার এই ছোট মেয়েটার দিকে নজর দিবে?"

আমার বই . কম
amarboi.com

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "না না, এটা তো হতেই পারে না। আমি দেখি কী করা যায়।"

"কিন্তু স্যার ভোটকা হান্নান যদি জানে আমি আপনার কাছে নালিশ দিয়েছি, তাহলে স্যার আমার লাশ পড়ে যাবে স্যার।"

"তাহলে কেমন করে হবে? আমি যদি ইউনিভার্সিটির প্রক্টর বা কাউকে বলতে যাই—"

"না না স্যার, সর্বনাশ! কাউরে বলা যাবে না।"

"তাহলে?"

"স্যার, আপনি বলেছিলেন না শারমিনের একটা ব্যারাম আছে। কঠিন ব্যারাম—ডিস্টিমিস্টি না কী যেন নাম।"

"ব্যারাম নয়, একটা ডিজঅর্ডার, ডিসলেক্সিয়া।"

"জি স্যার। আমি ভোটকা হান্নানকে সেটা বলেছি। আমি বলেছি, আপনি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। আপনার পারমিশন ছাড়া শারমিনকে কোথাও নেওয়া যাবে না।"

"গুড।" রাফি হাসি হাসি মুখে বলল, "ভেরি গুড। বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেছেন।"

"ভোটকা হান্নান যদি আপনার কাছে আসে, আপনি তারে বলবেন, শারমিনকে কোথাও নেওয়া ঠিক হবে না।"

"ঠিক আছে বলব। আপনি চিন্তা করবেন না।"

শারমিনের বাবা চলে যাওয়ার পরও রাফি চুপচাপ তার ডেস্কে বসে রইল। এই দেশে সাধারণ মানুষের জীবনটা বড় কঠিন।

মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটার পর ডিপার্টমেন্টের সব শিক্ষক তাদের সাপ্তাহিক মিটিং করতে বসে। এই মঙ্গলবার মিটিংটা শুরু করার পর দেখা গেল আলোচনা করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নেই। রাশেদ স্যার সুযোগ পেলেই জটিল একটি গবেষণার বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করবেন বলে কম বয়সী লেকচারাররা একটার পর একটা হালকা বিষয় নিয়ে আলাপ করতে শুরু করল। প্রফেসর হাসান সেই বিষয়গুলো সমান উৎসাহে আলোচনা করতে থাকলেন। একসময় রাফির দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারপর রাফি তোমার ক্লাস কেমন চলছে?"

রাফি বলল, "ভালো স্যার।"

সুহানা বলল, "ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ভীষণ পপুলার। বিশেষ করে ছাত্রীদের মধ্যে।"

সব শিক্ষক শব্দ করে এক ধরনের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। প্রফেসর হাসান ভুরু কুঁচকে বললেন, "কী ব্যাপার? একজন ইয়ং হ্যান্ডসাম মানুষকে তার ছাত্রীরা পছন্দ করছে—তাতে তোমরা এত হিংসা করছ কেন?"

রানা বলল, "না স্যার, আমরা মোটেও হিংসা করছি না—শুধু একটু সতর্ক করে দিতে চাইছি।"

"কী নিয়ে সতর্ক করবে?"

"ওদের হাইফাই ইউনিভার্সিটির ছাত্রীরা লেখাপড়া ছাড়া কিছু বোঝে না—সবাই হচ্ছে লেবদু টাইপের। আমাদের ইউনিভার্সিটির ছাত্রীদের অসম্ভব তেজ!"

আমার বই .কম
amarboi.com

কবির বলল, "সুহানাকে দেখলেই বোঝা যায়!"

সুহানা প্রতিবাদ করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই প্রফেসর হাসান রাফিকে জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন জায়গা, নতুন পরিবেশ, তোমার কোনো সমস্যা হচ্ছে না তো? আমি খোঁজও নিতে পারছি না—"

"না স্যার কোনো সমস্যা হচ্ছে না। সবাই খুব হেল্পফুল। ক্লাসও খুব ইন্টারেস্টিং, ক্লাসের বাইরেও খুব ইন্টারেস্টিং।"

সুহানা জানতে চাইল, "ক্লাসের বাইরে ইন্টারেস্টিং কী হলো?"

রাফি বলল, "আমরা যে টংয়ে চা খেতে যাই, সেখানে শারমিন নামের একটা ছোট মেয়ে আছে। সেই মেয়েটা যেকোনো ডিজিটের সংখ্যা দিয়ে যেকোনো ডিজিটের সংখ্যা গুণ করে ফেলতে পারে। আমার মোবাইলে যে ক্যালকুলেটর আছে সেটা নয় ডিজিটের—আমি সেটা দিয়ে টেস্ট করেছি।"

রাশেদ বললেন, "নয় ডিজিট তো অনেক।"

রাফি বলল, "হ্যাঁ। আমরা দুই ডিজিটের সংখ্যাকে কষ্ট করে পারি। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটার এক মুহূর্ত দেরি হয় না—তাকে কিছু করতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়।"

রানা বলল, "আশ্চর্য তো! আমাদের শারমিন? টংয়ের শারমিন?"

"হ্যাঁ।"

আমার বই . কম

সুহানা বলল, "আমরা চা-শিঙাড়া খেলেই সে বিল বলে দেয়। আমি মনে করতাম, বানিয়ে বানিয়ে বলছে।"

রাফি বলল, "ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, মেয়েটার কোনো ফরমাল লেখাপড়া নেই। এক শ পর্যন্ত গুণতে পারে। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—এসবের কনসেপ্ট নেই। এমনি গুণ করতে বললে পারে না—একটু ঘুরিয়ে বলতে হয়। এতজন মানুষ এতগুলো বিস্কুট খেয়েছে, বিল কত হবে—এভাবে!"

রাশেদ মাথা নাড়লেন, বললেন, "মোস্ট ইন্টারেস্টিং!"

রাফি বলল, "আমি লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম। ওর বাবা বলল, শারমিন লেখাপড়া করতে পারে না। কথা শুনে মনে হলো ডিসলেক্সিয়া।"

সুহানা জিজ্ঞেস করল, "ডিসলেক্সিয়া কী?"

রাফি ইতস্তত করে বলল, "এক ধরনের লারনিং ডিজঅর্ডার। কাগজের লেখা মনে হয় উল্টে গেছে।"

প্রফেসর হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, "হ্যাঁ। আসলে আমরা যে লেখাপড়া করি, এটা কিন্তু খুবই নতুন একটা ব্যাপার—হয়তো মাত্র কয়েক

শ বছরের ব্যাপার। আদিম মানুষ লেখাপড়া করত না। কাজেই বলতে পারো আমাদের অনেকের ব্রেন সেটার জন্য রেডি হয়নি—সেটা হচ্ছে ডিসলেক্সিয়া। আমরা যে রকম লেখা পড়তে পারি, অর্থাৎ আমাদের ব্রেন যেভাবে একটা গ্রাফিক সিম্বলকে ইন্টারপ্রেট করতে পারে, ডিসলেক্টিক মানুষেরা পারে না।"

সুহানা জানতে চাইল, "এর চিকিৎসা নেই স্যার?"

"ঠিক চিকিৎসা নেই, তবে এটাকে মেনে নিয়ে মানুষজন অন্যভাবে লিখতে-পড়তে শেখে। এর সঙ্গে আইকিউয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। অনেক স্মার্ট মানুষ আছে, যাদের ডিসলেক্সিয়া। আমার ধারণা, বাদশাহ আকবরের ডিসলেক্সিয়া ছিল!"

"কেন স্যার?"

"আকবর খুব স্মার্ট মানুষ ছিল, কিন্তু লেখাপড়া শেখেনি! মনে হয়, শিখতে পারেনি ডিসলেক্সিয়ার কারণে।"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "ডিসলেক্সিয়া হলে কীভাবে লেখাপড়া করে?"

"আমি ঠিক জানি না। অনেক দিন আগে টেলিভিশনে একটা প্রোগ্রাম দেখেছিলাম। একদল রিসার্চারের ধারণা, সাদার ওপরে কালো লেখাটা হচ্ছে সমস্যা। সাদার বদলে লাল কাগজে লিখলেই অনেক ডিসলেক্টিক মানুষ পড়তে পারে। যদি লাল কাচের চশমা পরে কিংবা লাল আলোতে চেষ্টা করে, তাহলে অনেকেই নাকি পড়তে পারে।"

আমার বই.কম
amarboi.com

রাফি অবাক হয়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

প্রফেসর হাসান বললেন, "তবে টেলিভিশনের সব কথা বিশ্বাস করতে নেই। বেশির ভাগই ভুয়া।"

কবির বলল, "কিন্তু শারমিনের নয় ডিজিটের সংখ্যা গুণ করার ক্ষমতাটা তো খুবই ইন্টারেস্টিং! আমাদের এত দিন ধরে চা খাওয়াচ্ছে আমরা জানি না, আর রাফি এসে এক দিনে বের করে ফেলল।"

সুহানা বলল, "তোদের গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

"আমি একা কেন, তোদেরও গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

"ঠিকই বলেছিস, আমাদের সবার গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "মরতে চাইলে মরো, কিন্তু তার আগে সবাই নিজের নিজের পরীক্ষার খাতা দেখে কমিটির কাছে জমা দেবে।"

রানা বলল, "স্যার, আপনার জন্য আমরা শান্তিতে মরতেও পারব না?"

"না। পারবে না।"

সুহানা বলল, "শারমিন মেয়েটির যদি ডিসলেক্সিয়া না থাকত তাহলে অনেক বড় ম্যাথমেটিশিয়ান হতে পারত?"

প্রফেসর হাসান বললেন, "নো নো! ডোন্ট গেট ইট রং। মাথার ভেতরে বড় বড় গুণ করে ফেলার ক্ষমতা আর ম্যাথমেটিশিয়ান হওয়া এক জিনিস না। এক শ টাকার ক্যালকুলেটরও বড় বড় গুণ করতে পারে। তার মানে এই না যে এক শ টাকার ক্যালকুলেটর খুব বড় ম্যাথমেটিশিয়ান!"

"তার মানে এই গিফটার কোনো গুরুত্ব নেই?"

"যদি শুধু বড় বড় গুণ করতে পারে আর কিছু পারে না, তাহলে সে রকম গুরুত্ব নেই। ইন্টারেস্টিং কিন্তু সে রকম গুরুত্বপূর্ণ না। মাঝেমধ্যেই এ রকম মানুষ পাওয়া যায়। কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার আগে এ রকম মানুষ খুব ইউজফুল ছিল। গাউস তার জীবনে এ রকম মানুষকে ব্যবহার করে অনেক ক্যালকুলেশন করেছেন।"

রাশেদ বললেন, "অনেক অটিস্টিক স্যাভেন্ট আছে যারা এ রকম পারে। আর কিছু পারে না, কিন্তু এ রকম ক্যালকুলেশন করতে পারে। পাইয়ের মান কয়েক শ ডিজিট পর্যন্ত বের করে ফেলতে পারে!"

আমার বই. কম
amarboi.com

"তাই?" সুহানার কেমন যেন মন খারাপ হলো। বলল, "আমি আরও ভাবছিলাম শারমিন এখন ফেমাস হয়ে যাবে। এত কিউট একটা মেয়ে কত কষ্ট করে, তার টাকা-পয়সার সমস্যা মিটে যাবে।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "সেটা হয়তো হতে পারে। আজকালকার টিভি চ্যানেলগুলো যদি খবর পায়, তাহলে তাকে নিয়ে প্রোগ্রাম শুরু করে দেবে—কিন্তু ইন দ্য লং রান ব্যাপারটা ভালো হয় না। ছোট বাচ্চাদের ফেমাস বানানো ঠিক না। ক্ষতি হয়।"

রাফির মুখ নিশপিশ করছিল ভোটকা হান্নানের কথা বলার জন্য, কিন্তু সে বলল না। শারমিনের বাবা খুব করে বলে দিয়েছে সে যেন কাউকে না বলে। তবে বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর হাসানের সঙ্গে কথা বলা যায়—এই মানুষটি অনেক কিছু জানেন। তাকে বললে মনে হয় ঠিক ঠিক সাহায্য করতে পারবেন। ইউনিভার্সিটিতে নতুন এসেই সে ভোটকা হান্নানদের সঙ্গে ঝামেলা করতে চায় না।

মিটিং শেষে যখন সবাই চলে গেল, তখন রাফি প্রফেসর হাসানের কাছে গিয়ে বলল, "স্যার আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "নিরিবিলি?"

"জি স্যার। নিরিবিলি।"

"বল।"

"কথাটা শারমিন নামের মেয়েটিকে নিয়ে।"

প্রফেসর হাসান বললেন, "কী কথা?"

"আমি যখন শারমিনের গুণ করার ক্ষমতাটা টেস্ট করছি, তখন আশপাশে অনেক ছাত্রছাত্রী ছিল, তার ব্যাপারটা জেনে গেছে।"

"তারা এখন মেয়েটাকে জ্বালাচ্ছে?"

"তা একটু জ্বালাচ্ছে, কিন্তু সেটা সমস্যা না। সমস্যা অন্য জায়গায়।"

"কোন জায়গায়?"

"একটা মাস্তান ছাত্রনেতা শারমিনকে তুলে নিতে চাচ্ছে।"

প্রফেসর হাসান ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, "শারমিনের বয়স কত?"

"দশ-এগার হবে।"

"এত ছোট মেয়েকে তুলে নিতে চাচ্ছে কেন?"

"তাকে টিভি চ্যানেলে নিয়ে যাবে।"

প্রফেসর হাসান হতাশার ভঙ্গি করে মাথা নাড়লেন, বললেন, "মাস্তানের নাম কী?"

আমারবই.কম
amarboi.com

রাফি বলল, "তার বাবা কাউকে বলতে না করেছে, সেই জন্য সবার সামনে বলিনি। নাম হান্নান। সবাই ডাকে ভোটকা হান্নান।"

"কখনো নাম শুনিনি। যাই হোক মেয়ের বাবাকে বলো চিন্তা না করতে। উই উইল টেক কেয়ার।"

"আপনাকে হয়তো কিছু করতে হবে না, শারমিনের বাবা হান্নানকে বুঝিয়েছে শারমিনের খুব কঠিন অসুখ। অসুখের নাম ডিসলেক্সিয়া। আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। কাজেই আমি অনুমতি না দিলে তাকে কোথাও নেওয়া যাবে না।"

প্রফেসর হাসান হাসলেন, "ভালোই বলেছে। স্মার্ট ম্যান।"

"কাজেই মনে হয় আমার কাছে ওই মাস্তান আসবে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করব। আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।"

"ভালো করেছ। দরকার হলে আমি দেখব। ওই মাস্তানদের কোনো পাত্তা দেবে না।"

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "না স্যার পাত্তা দেব না।"

পরদিন সকালে রাফি ইন্টারনেটে ডিসলেক্সিয়া নিয়ে পড়াশোনা করছে, অবাক হয়ে দেখল আইনস্টাইন, পাবলো পিকাসো, টমাস এডিসন থেকে শুরু ওয়াল্ট ডিজনি, টম ক্রুজ—সবাই নাকি ডিসলেক্সিক! মনে হচ্ছে ডিসলেক্সিয়া না হওয়া পর্যন্ত কোনো সৃজনশীল কাজ করা যায় না।

ঠিক এ রকম সময় দরজা থেকে নাকি গলার স্বরে কে যেন বলল, "আসতে পারি?"

রাফি তাকিয়ে দেখে অসম্ভব শুকনো একজন ছেলে, টেলিভিশনে এইডসের রোগীদের অনেকটা এ রকম দেখায়। গালভাঙা এবং কোটরাগত চোখ, তবে মাথায় বাহারি চুল। রাফি বলল, "আসো।"

ছেলেটি ভেতরে ঢুকে বলল, "আপনার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি।"

"তুমি কে?"

ছেলেটি একটু থতমত খেয়ে বলল, "আমার নাম হান্নান।"

"তুমি কি আমাদের ডিপার্টমেন্টের ছাত্র?"

"না। আমি ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টের। ফোর্থ ইয়ার সেকেন্ড সেমিস্টার।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"কী ব্যাপার। বলো।"

"আমাকে চিনেছেন স্যার? ক্যাম্পাসে সবাই আমাকে চিনে।"

"আমি নতুন এসেছি সবাইকে চিনি না।"

"আমি তো স্যার ছাত্র সংগঠন করি, আমাকে অনেকে ভোটকা হান্নান বলে।"

রাফি এবার কষ্ট করে তার বিস্ময় গোপন করল। বলল, "ও আচ্ছা। তোমাকে ভোটকা হান্নান ডাকে?"

ছেলেটি একটু হাসল, তার প্রয়োজনের চাইতে বেশি দাঁত, দাঁতের রং হলুদ, মাড়ির রং কালো। বলল, "জি স্যার।"

"নামটা ঠিক হয়নি।"

"জানি স্যার।"

"কী বলবে বলো।"

ভোটকা হান্নান কীভাবে কথাটা শুরু করবে, রাফি সেটা শোনার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

ভোটকা হান্নান গলা খাকাড়ি দিয়ে বলল, "আমাদের যে টংগুলো আছে সেখানে মাহতাবের একটা টং আছে। খুবই গরিব স্যার, আমরা হেল্প করার জন্য এই টংটা বানিয়ে দিয়েছি।"

রাফি বলল, "ভেরি গুড।"

"মাহতাবের ছোট মেয়ে তার বাবাকে সাহায্য করে, আমরাও দেখেশুনে রাখি। সেই মেয়ে নাকি বড় বড় গুণ মুখে মুখে করে ফেলে। আমি ভাবলাম, মেয়েটাকে একটু সাহায্য করি।"

ভোটকা হান্নান তার মুখে একটা গাম্ভীর্য ধরে রেখে বলল, "ঢাকায় টিভি চ্যানেল, পত্রিকার সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আমি ভাবছি কয়েকটা চ্যানেলে প্রোগ্রাম করিয়ে—"

রাফি এবার তাকে থামাল। বলল, "দেখো হান্নান, ওই মেয়েটা যে এভাবে গিফটেড সেটা কেউ জানত না। আমি বের করেছি। আমি আরও একটা জিনিস বের করেছি, সেটা হচ্ছে মেয়েটা সিরিয়াসলি ডিসলেক্টিক। ওই মেয়েটার সাহায্য দরকার, রেডিও-টেলিভিশনে তার এক্সপোজারের কোনো দরকার নেই।"

"কিন্তু স্যার যদি টেলিভিশনে দেখিয়ে সাহায্য চাওয়া যায়—"

"ছিঃ! সাহায্য চাইবে কেন? সাহায্য মানে তো ভিক্ষা, এই বাচ্চা মেয়ে ভিক্ষা করবে কেন?"

ভোটকা হান্নান একটু থতমত খেয়ে গেল। টাকা-পয়সা তার কাছে সব সময়ই অমূল্য জিনিস, সেটা চাঁদাবাজি করেই আসুক আর ভিক্ষে করেই আসুক, সেটাকে কেউ এভাবে ছিঃ বলে উড়িয়ে দিতে পারে, আগে বুঝতে পারেনি। সে আবার চেষ্টা করল। বলল, "টেলিভিশনে দেখালে একটা পরিচিতি হবে—"

রাফি এবার একটু কঠিন মুখ করে বলল, "দেখো হান্নান, তুমি আমার কাছে কেন এসেছ জানি না। আমি এই ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে জুনিয়র টিচার, এক সপ্তাহও হয়নি জয়েন করেছি। এই মেয়েটিকে নিয়ে তুমি টিভিতে যাবে, না সিনেমাতে যাবে সেটা নিয়ে আমার সাথে কথা বলার দরকার থাকার কথা নয়। কিন্তু ঘটনাক্রমে যে কারণে তুমি তাকে টিভিতে নিতে যাচ্ছো, সেই কারণটা আমি বের করেছি। কাজেই আমার একটু দায়-দায়িত্ব এসে পড়েছে। বুঝেছো?"

"জি স্যার, কিন্তু—"

"আমার কথা আগে শেষ করি।" রাফি মুখ আরও কঠিন করে বলল, আমি এই মেয়ের গার্জিয়ান না, কিন্তু যে গার্জিয়ান তাকে বলো, যদি সে মেয়ের ভালো চায়, যেন কোনোভাবেই তাকে রেডিও-টেলিভিশনে না পাঠায়।"

"কিন্তু স্যার, আমি অলরেডি চ্যানেলে, খবরের কাগজে যোগাযোগ করেছি, তারা রাজি হয়েছে।"

"আবার যোগাযোগ করো। করে বলো সম্ভব নয়।"

ভোটকা হান্নান এবার তার নিজের মুখটা কঠিন করে বলল, "না স্যার, আমি সেটা করব না। যেহেতু কথা দিয়েছি, কথা রাখতে হবে স্যার।"

"ভেরি গুড। কিন্তু তুমি আমার কাছে কেন এসেছ? যদি জোর করে এই মেয়েকে তুলে নিতে চাও, সেটা তোমার ব্যাপার। বাচ্চা মেয়ে গার্ডিয়ানের অনুমতি ছাড়া তুলে নিয়ে স্ট্রেট শিশু অপহরণের মামলায় পড়ে যাবে।"

ভোটকা হান্নান তার কালো মাড়ি এবং দুই প্রস্থ হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলল, "আমার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার সাহস কেউ করবে না! আপনি নতুন এসেছেন তাই জানেন না। এমনি এমনি আমার নাম ভোটকা হান্নান হয়নি।"

"ঠিক আছে ভোটকা হান্নান। তুমি যেটা করতে চাও করো। আমি আমাদের হেডকে জানাব। স্যার যদি চান প্রক্টর, ভিসি, পুলিশকে জানাবেন। তুমি তোমারটা করবে, আমি আমারটা করব।"

ভোটকা হান্নানকে এবার একটু দুর্বল দেখাল, মাথা চুলকে বলল, "আমি ভাবলাম গরিব ফ্যামিলি সাহায্য করি। আপনি দেখি উল্টা কথা বলছেন।"

"এটা উল্টা কথা না, এটা সোজা কথা। ছোট বাচ্চাকে ছোট বাচ্চাদের মতো থাকতে দিতে হয়। টেলিভিশনে টানাটানি করতে হয় না।"

"কিন্তু স্যার অলরেডি মোবাইল করে দিয়েছি।"

"আবার মোবাইল করে দাও। যাও।"

ভোটকা হান্নানকে কেমন জানি মনমরা দেখাল। সে তার গাল চুলকাতে চুলকাতে বের হয়ে গেল।

৪.

অ্যাসিসট্যান্ট এডিটর বাকের ঈশিতাকে বলল, "এই যে নাও, এই চিঠিগুলো তোমার জন্য।"

ঈশিতা বলল, "থাক, আমি এমনিতেই বেশ আছি, তোমার চিঠি না হলেও চলবে!"

বাকের প্রত্যেক দিন চিঠিগুলো থেকে উদ্ভট চিঠিগুলো আলাদা করে ঈশিতাকে পড়তে দেয়। সারা দেশ থেকে বিচিত্র বিচিত্র চিঠি আসে, কারও জিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও গ্রামে মানুষখেকো বিচিত্র প্রাণী, কেউ কবর দেওয়ার পর জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে, কারও গ্রামে দুই মাথাওয়ালা বাছুর জন্ম দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। বাকের বলল, "পড়ে দেখো। আজকের চিঠিতে তুমি পাবে মাত্র দশ হাজার টাকার মনুষ্যরূপী কম্পিউটার।"

"মনুষ্যরূপী কম্পিউটার?" এবার ঈশিতা একটু কৌতূহল দেখাল, "কোথায়, দেখি?"

বাকের একটা খাম ঈশিতার দিকে এগিয়ে দিল। ঈশিতা চিঠি খুলে পড়ে। হেলাল নামের একজন লিখেছে—তাকে মাত্র দশ হাজার টাকা দিলেই সে খবরের কাগজে "মানুষ কম্পিউটারের" সঙ্গে ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দেবে। এই মানুষ কম্পিউটারের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে, সে বার বছরের বালিকা, চোখের পলকে যেকোনো সংখ্যার সঙ্গে অন্য যেকোনো সংখ্যা গুণ করে ফেলতে পারে। চিঠির নিচে একটা মোবাইল ফোনের নম্বর দেওয়া আছে।

বাকের জিজ্ঞেস করল, "কী? মাত্র দশ হাজার টাকায় মানুষ কম্পিউটার কিনতে চাও? কোন অপারেটিং সিস্টেম দেবে বলেছে?"

ঈশিতা হাসল। বলল, "না হার্ড ড্রাইভের সাইজ কিংবা অপারেটিং সিস্টেম কিছুই দেওয়া নেই। তার পরও হয়তো আমি ফোন করতাম, কিন্তু

আমার বই.কম
amarboi.com

এই দশ লাইনের চিঠিতে প্রায় দুই ডজন বানান ভুল। যে চিড়িয়া দন্ত্যস দিয়ে মানুষ বানান করে তাকে সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক না।"

তারপরও ঈশিতা হেলাল নামের মানুষটির টেলিফোন নম্বরটা টুকে রাখল। কিছুদিন আগে এনডেভারের সঙ্গে তার সেই অভিজ্ঞতার পর থেকে যে কয়েকটা বিষয় নিয়ে তার কৌতূহল হয়েছে, তার একটা হচ্ছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। বিষয়টা নিয়ে সে কিছুই জানত না। গত কিছুদিন থেকে সে পড়াশোনা করার চেষ্টা করছে। সে জার্নালিজমের ছাত্রী। বিজ্ঞান, গণিত, কম্পিউটার—এসব খুঁটিনাটি বিষয় ভালো বোঝে না। কী পড়াশোনা করবে, বুঝতে পারছে না। তাই ইন্টারনেট থেকে কিছু জিনিসপত্র ডাউনলোড করে পড়ার চেষ্টা করছে। ইন্টারনেটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে ঠিক যে বিষয়টা জানতে চায় সেটা ছাড়া সেখানে অন্য সবকিছু আছে। যদি ঠিক সেই বিষয়টা পেয়েও যায়, তাহলে সেটা হয় এমন দুর্বোধ্যভাবে লেখা আছে, যা পড়ে মাথামুণ্ডু কিছু বোঝার উপায় নেই, কিংবা হাস্যকর ছেলেমানুষিভাবে লেখা যে সেটা পড়ে পুরো বিষয়টা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা হয়ে যায়। তার প্রয়োজন একজন মানুষের যে এটি সম্পর্কে জানে এবং যে তাকে একটু সময় দেবে। ঈশিতার বয়স বেশি না, সেজেগুজে থাকলে তাকে মনে হয় বেশ ভালোই দেখায়, যদিও সে কখনোই সেজেগুজে থাকে না। কাজেই যাদের একটু সময় দেওয়া দরকার, দেখা যায় তারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে এবং সময়টা দিচ্ছে ভুল জায়গায়!

আমার বই . কম
amarboi.com

ঈশিতা যদিও বলেছিল, দন্ত্যস দিয়ে মানুষ বানান করা হেলাল নামের সেই মানুষটিকে সিরিয়াসলি নেওয়া ঠিক না। তার পরও বিকেলের দিকে সে তাকে ফোন করল। যে ফোন ধরল, তার গলার স্বর আনুনাসিক, মনে হলো মানুষটির সর্দি হয়েছে। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "আমি কি হেলাল সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি?"

"জে। কথা বলছি।"

"আমরা আপনার একটা চিঠি পেয়েছি। আপনি বলেছেন আপনি একজন মানুষ কম্পিউটারকে চেনেন, আপনাকে দশ হাজার টাকা দিলে আপনি তার সঙ্গে ইন্টারভিউ করার ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"জি বলেছিলাম। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"একটা সমস্যা হয়েছে।"

"কী সমস্যা?"

"সেটা শুনে লাভ নাই। আপনি বুঝবেন না। সোজা কথায় দশ হাজার টাকায় হবে না। মেয়েটার বাপ বেঁকে বসেছে।"

ঈশিতা খুব মিষ্টি করে বলল, "আসলে আমি কিন্তু একবারও বলিনি যে আমরা টাকা দিয়ে এই খবরটা পেতে চাচ্ছি। নীতিগতভাবে আমরা টাকা দিয়ে খবর কিনি না। মেয়েটার বাবা যদি রাজি না থাকেন তাহলে তো কিছু করার নেই।"

"আসলে মেয়ের বাপ মহা ধুরন্ধর।"

ঈশিতা হঠাৎ করে প্রশ্ন করল, "আপনি কী করেন?"

"আমি? আমি স্টুডেন্ট। ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। কেন?"

"না না, এমনি জানতে চাইছি। কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়েন?"

ছেলেটি ইউনিভার্সিটির নাম বলল, মনে হলো একটু অহংকারের সঙ্গেই। মফস্বল শহরের ছোট ইউনিভার্সিটি, সেটা নিয়ে এই হাবাগোবা ছেলেটির এত অহংকার কেন কে জানে। ঈশিতা তার সাংবাদিকসুলভ কায়দায় শেষ চেষ্টা করল। সে জানে রথী মহারথী থেকে শুরু করে খুব সাধারণ মানুষ, সবারই পত্রিকায় ছবি ওঠানোর শখ থাকে। তাই সে বলল, "আমরা টাকা দিয়ে কোনো খবর কিনতে পারব না, কিন্তু আপনি যদি এমনি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেন রিপোর্টিং করার সময় আপনার ছবি রেফারেন্স দিতে পারি।"

এই কথাটায় ম্যাজিকের মতো কাজ হলো। টেলিফোনের অন্য পাশে হেলাল নামের ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ঠিক আছে ম্যাডাম, আপনি যখন এভাবে বলছেন, দেখি চেষ্টা করে। সমস্যা হয়েছে একজন চ্যাংড়া টিচার নিয়ে।"

"কী হয়েছে এই চ্যাংড়া টিচারের?"

"এই হ্যানো ত্যানো বড় বড় কথা! বাচ্চা মেয়ে, তাকে রেডিও-টেলিভিশনে নেওয়া ঠিক না—এই সব বড় বড় বোলচাল।"

"আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন—" ঈশিতা বলল, "আমি আপনার চ্যাংড়া টিচারকে ম্যানেজ করে নেব।"

রাফি লেকচার তৈরি করতে করতে মুখ তুলে দেখে দরজায় ফতুয়া এবং জিন্স পরা তেজি ধরনের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটির কাঁধ থেকে বিশাল একটা ক্যামেরা ঝুলছে। মেয়েটি ঈশিতা এবং রাফি ঘুণাক্ষরেও

আমার বই. কম
amarboi.com

অনুমান করতে পারেনি সে তাকে "ম্যানেজ" করতে ঢাকা চলে এসেছে। রাফি থতমত খেয়ে বলল, "আমার কাছে?"

"আপনি কি রাফি?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনার কাছে।" ঈশিতা ভেতরে ঢুকল, একটা চেয়ার টেনে বসল, ক্যামেরাটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, "আমার নাম ঈশিতা। আমি একটা পত্রিকায় কাজ করি। ঢাকা থেকে এসেছি।"

রাফি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। ঈশিতা হাসিমুখ করে বলল, "পত্রিকার মানুষকে অনেকে ভয় পায়। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

রাফি বলল, "না, আমি ভয় পাচ্ছি না। আমি মাকড়সা ছাড়া আর কিছু ভয় পাই না।"

"বলতেই হবে আপনি খুব সাহসী মানুষ। আমি তেলাপোকা, জোঁক, কেঁচো, সাপ এবং অন্য যেকোনো পিছলে জিনিস যেটা নড়ে সেটাকে ভয় পাই।"

রাফি হাসার ভঙ্গি করে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল, সে কেন তার কাছে এসেছে। ঢাকা থেকে একজন সাংবাদিকের তার কাছে চলে আসার খুব বেশি কারণ থাকার কথা নয়—সম্ভবত কোনোভাবে শারমিনের খোঁজ পেয়েছে।

amarboi.com

ঈশিতা হঠাৎ মাথাটা একটু এগিয়ে গলা নামিয়ে বলল, "আমি আসলে আপনাকে ম্যানেজ করতে এসেছি!"

"ম্যানেজ করতে?" রাফি চোখ বড় বড় করে বলল, "আমাকে?"

"হ্যাঁ। আপনাদের একজন ছাত্রের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছে, নাম হেলাল। সে আমাকে বলেছে, আপনাকে যদি আমি কোনোভাবে ম্যানেজ করতে পারি, তাহলে সে আমাকে একটা মানুষ কম্পিউটার দেখাবে!"

"আমাকে ম্যানেজ করলে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে ম্যানেজ করবেন, ঠিক করেছেন?"

"এখনো করিনি। সেই জন্য আগে আপনাকে একটু দেখতে চেয়েছিলাম!"

"দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। এখন মনে হচ্ছে আসলে ম্যানেজ করার দরকার নেই। হয়তো ম্যানেজ না হয়েই আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবেন।"

"কী সাহায্য?"

ঈশিতা কয়েক মুহূর্ত কিছু একটা ভাবল, তারপর বলল, "আমি জার্নালিজম পড়েছি। কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারি, ই-মেইল পাঠাতে পারি, গুগলে সার্চ দিতে পারি, ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিতে পারি কিন্তু কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে, তার কিছু জানি না। জানার দরকারও ছিল না, কোনো উৎসাহও ছিল না। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"কিন্তু এখন আমার হঠাৎ খুব জানার দরকার, কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে। বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে, ইন্টারনেটে ঠেলাঠেলি করে কিছু একটা হয়তো জানতে পারতাম—কিন্তু তাতে সমস্যা হচ্ছে যে আমি তখন ঠিক জিনিসটা শিখতে পারতাম না। আমার মনে হলো, যদি কেউ আমাকে একটু বলে দিত তাহলে আমি জিনিসটা ঠিক করে বুঝতে পারতাম।"

রাফি ইতস্তত করে বলল, "কম্পিউটার কীভাবে কাজ করে, সেটা আমার কাছ থেকে জানার জন্য আপনি ঢাকা থেকে চলে এসেছেন? আজকাল কত বই, কত কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট, কত কম্পিউটার সেন্টার—"

"হ্যাঁ। আছে, কিন্তু তারা যে কম্পিউটার নিয়ে কথা বলে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার। আমার জানার দরকার নিউরাল কম্পিউটার।"

আমার বই . কম
amarboi.com

রাফি এবার তার চেয়ারে হেলান দিয়ে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করল, "নিউরাল কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ।" ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "বইপত্র, ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি করে আমি যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে, মানুষের ব্রেন আমাদের ল্যাপটপের মতো কাজ করে না—ল্যাপটপ হচ্ছে ডিজিটাল কম্পিউটার। মানুষের ব্রেনের মধ্যে আছে নিউরন, সেটা দিয়ে তৈরি হয়েছে নিউরাল নেটওয়ার্ক। নিউরাল নেটওয়ার্ক দিয়ে কেউ কম্পিউটার তৈরি করলে সেটা হবে নিউরাল কম্পিউটার। ঠিক বলছি?"

রাফি মাথা নাড়ল। ঈশিতা বলল, "অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী হতে পারে। উল্টাপাল্টা কিছু বললে থামাবেন। আমি আপনার কাছে এসেছি দুটি কারণে। এক. গত আইসিটি আইটি কনফারেন্সে আপনি নিউরাল নেটওয়ার্কের ওপর একটা পেপার দিয়েছেন। পেপারটা আমি পড়েছি, একটা লাইন দূরে থাকুক, একটা শব্দও বুঝিনি।"

রাফি বলল, "সরি।"

ঈশিতা বলল, "আপনার সরি হওয়ার কোনো কারণ নেই। সেই পেপারটা দেখে আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি নিউরাল কম্পিউটারে এক্সপার্ট।"

"আমি মোটেও এক্সপার্ট না।"

"যখন কারও লেখার একটা শব্দও বোঝা যায় না, তখন সে হচ্ছে এক্সপার্ট। আপনি অবশ্যই এক্সপার্ট। যাই হোক—" ঈশিতা রাফিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলল, "আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আপনার ইউনিভার্সিটির হেলাল নামে একটা ছেলে আমাকে বলেছে, এখানে একজন মেয়ে হচ্ছে মানুষ কম্পিউটার! আপনি নিশ্চয়ই সেই মেয়েটাকে চেনেন। নিশ্চয়ই জানেন মেয়েটা কেমন করে কম্পিউটার। গবেষণা করার একটা মানুষ কম্পিউটার আপনার কাছে আছে, যেটা অন্য কারও কাছে নেই। আমি আপনার কাছে জানতে চাই, মেয়েটা কেমন করে এটা করে!"

ঈশিতা তার টানা বক্তব্য শেষ করে চেয়ারে হেলান দিল। রাফি কিছুক্ষণ ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "এত জিনিস থাকতে আপনি এই জিনিস পত্রিকায় লিখতে এত ব্যস্ত হলেন কেন?"

ঈশিতা বলল, "আমি মোটেও এটা নিয়ে পত্রিকায় আর্টিকেল লিখতে ব্যস্ত হইনি।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"তাহলে?"

"আমি এটা জানতে চাই।"

"কেন?"

ঈশিতা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেটা আমি আপনাকে বলতে পারব না। খুব যদি চাপাচাপি করেন তাহলে আমি বানিয়ে বানিয়ে কিছু একটা বলে দেব—আপনি টেরও পাবেন না যে আমি মিথ্যে কথা বলছি। আমি খুব সরল মুখ করে সিরিয়াস ব্লাফ দিতে পারি।"

রাফি হেসে বলল, "আপনাকে ব্লাফ দিতে হবে না। আমি চাপাচাপি করব না! তবে আপনি যেসব জিনিস জানতে চাইছেন, আমি যে তার সবকিছু জানি, তা না। শুধু যে জানি না, তা না। অনেক কিছু আছে যেগুলো আমি কেন, পৃথিবীর কেউই জানে না।"

"কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই সেগুলো জানতে চাইছেন, চাইছেন না?"

"তা চাইছি।"

"আমার অনুরোধ, আপনি যদি কিছু জানেন সেটা আমাকে কষ্ট করে একটু বুঝিয়ে দেবেন। আর কিছু না।"

রাফি বলল, "ঠিক আছে। যদি আপনারা এই বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া না করেন, তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই।"

"কথা দিচ্ছি টানাহ্যাঁচড়া করব না।"

"তাহলে ঠিক আছে।"

ঈশিতা বলল, "ভেরি গুড। আমি তাহলে এখন উঠি।"

"কোথায় যাবেন?"

"হেলাল নামক ছেলেটার সঙ্গে একটু কথা বলি। তাকে খুশি করার জন্য দু-চারটা ছবি তুলতে হবে।" ঈশিতা চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে বলল, "এই হেলাল খুব করিৎকর্মা ছেলে হতে পারে, কিন্তু তার বাংলা বানানের জ্ঞান ভালো না। দন্ত্যস দিয়ে মানুষ লিখে।"

রাফি হাসল, "নেতা মানুষ বানান দিয়ে কী করবে?"

ঈশিতা ভুরু কুঁচকে বলল, "নেতা নাকি?"

"হ্যাঁ। সিরিয়াস নেতা।"

"তাহলে একটু সাবধানে ডিল করতে হবে।"

ঈশিতা তার ক্যামেরা ঘাড়ে ঝুলিয়ে যখন বের হয়ে যাচ্ছে, তখন রাফি একটু ইতস্তত করে বলল, "আজ বিকেলে আপনার কী প্রোগ্রাম?"

আমার বই . কম

"কোনো প্রোগ্রাম নেই।"

amarboi.com

"পাঁচটার দিকে ছাত্রদের বাসটা চলে যাওয়ার পর ক্যাম্পাস একটু ফাঁকা হয়। আমি ঠিক করেছিলাম তখন আপনার কম্পিউটার মেয়েটাকে নিয়ে একটু বসব। আপনি চাইলে তখন আপনিও আমার সাথে থাকতে পারেন।"

"অবশ্যই থাকব। একশবার থাকব।"

"তাহলে আপনি সাড়ে পাঁচটার দিকে চলে আসবেন আমার রুমে।"

"আসব।"

"শুধু একটা কন্ডিশন—"

ঈশিতা বলল, "মেয়েটাকে নিয়ে কোনো রিপোর্ট করা যাবে না!"

"হ্যাঁ।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন। আমি রিপোর্ট করব না।"

বিকেল বেলা রাফি তার ঘর থেকে ঈশিতাকে নিয়ে বের হলো। বের হওয়ার আগে সে টেবিল থেকে একটা বই নিয়ে নেয়—ক্লাস ওয়ানের বর্ণমালা শেখার বই।

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "এই বইটি কেন?"

আপনাকে যে মেয়েটির কাছে নিয়ে যাচ্ছি সেই মেয়েটি বিশাল বিশাল সংখ্যাকে মুহূর্তের মধ্যে গুণ করে ফেলতে পারে, কিন্তু একটা অক্ষরও পড়তে পারে না!

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। মেয়েটার ডিসলেক্সিয়া।"

"ডিসলেক্সিয়া?" ঈশিতা মাথা নেড়ে বলল, "আমি এটার কথা শুনেছি। আজকাল দুষ্টু বাচ্চাদের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেই বলা হয় ডিসলেক্সিয়া, না হয় এডিডি—অ্যাটেনশন ডেফিশিয়েন্সি ডিজঅর্ডার। তারপর কিছু বোঝার আগেই প্রোজাক প্রেসক্রিপশন করে দেয়। দেখতে দেখতে চটপটে একটা বাচ্চা কেমন যেন ভেজিটেবলের মতো হয়ে যায়।"

রাফি বলল, "আমি যে মেয়েটার কাছে নিচ্ছি সে মোটেও দুষ্টু নয়, অ্যাটেনশনেরও সমস্যা নেই। মেয়েটা হচ্ছে একেবারে ক্ল্যাসিক কেস অব ডিসলেক্সিয়া। মেয়েটা সে জন্য পড়তে শেখেনি। আমি এই বইটা নিয়ে যাচ্ছি তাকে একটু টেস্ট করার জন্য।"

ঈশিতা মাথা নেড়ে বলল, "ইন্টারেস্টিং।"

টংয়ের কাছে গিয়ে রাফি দেখল সেখানে খুব ভিড়। জিলাপি ভাজা হচ্ছে এবং অনেকে সেই জিলাপি খাচ্ছে। শারমিন প্লেটে করে জিলাপি দিচ্ছে, চা দিচ্ছে এবং কার কত বিল হয়েছে, সেটা জানিয়ে দিচ্ছে। রাফি ঈশিতাকে গলা নামিয়ে বলল, "এই হচ্ছে সেই মেয়ে, নাম শারমিন।"

"কী সুইট মেয়েটা।"

"হ্যাঁ, অনেক সুইট।"

রাফিকে দেখে শারমিনের বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শারমিনকে বলল, "স্যারের জন্য বেঞ্চটা মুছে দে তাড়াতাড়ি।"

রাফি বলল, "বেঞ্চ মুছতে হবে না। বরং শারমিনকে আমার কাছে পাঠান পাঁচ মিনিটের জন্য।"

"জি স্যার! জি স্যার।" বাবা আরও ব্যস্ত হয়ে পড়ল। শারমিনকে বলল, "দেখ দেখি স্যার কী বলেন।"

শারমিন সঙ্গে সঙ্গে তার ফ্রকে হাত মুছে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, "জি স্যার।"

রাফি বলল, "আমি তোমার একটা জিনিস একটু টেস্ট করতে চাই। তুমি একটু আমার সঙ্গে আসো, আমরা ওই পাশে গিয়ে বসি।"

আমারবই.কম
amarboi.com

রাফি ঈশিতাকে নিয়ে টংয়ের কাছে বড় একটা গাছের পাশে বসল। শারমিন বসল তাদের সামনে, তার চোখেমুখে এক ধরনের উত্তেজনা।

রাফি তার বইটা বের করে বলল, "আমি একটা বই নিয়ে এসেছি, দেখি তুমি এটা পড়তে পার কি না।"

শারমিনের মুখটা কেমন যেন কালো হয়ে গেল, সে ফিস ফিস করে বলল, "আমি তো পড়তে পারি না স্যার।"

"আমি জানি। আমি দেখতে চাই তুমি কতটুকু পারো।"

"একটুও পারি না।"

"ঠিক আছে। তোমাকে পড়তে হবে না, তুমি আমাকে বলো তুমি কী দেখো।" রাফি বইয়ের একটা পৃষ্ঠা খুলে বলল, "এখানে কী আছে বলো।"

শারমিনের মুখটা কেমন জানি শুকনো হয়ে যায়, জিব দিয়ে নিচের ঠোঁটটা ভিজিয়ে বলল, "কয়েকটা আঁকাবাঁকা দাগ নড়ছে।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলছে, "নড়ছে?"

শারমিন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"কেমন করে নড়ছে?"

"ডানে-বাঁয়ে। মাঝে মধ্যে উল্টে যায়।"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "কী আশ্চর্য।"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি বলল, "মোটেও আশ্চর্য না। এটা হচ্ছে ডিসলেক্সিয়ার লক্ষণ।"

ঈশিতা বলল, "হতে পারে, কিন্তু তবুও আশ্চর্য।"

রাফি এবার বইয়ের ভেতর থেকে লাল রঙের একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক বের করে বইয়ের পৃষ্ঠার ওপর রেখে বলল, "শারমিন। এখন কী দেখা যাচ্ছে?"

শারমিনকে দেখে মনে হলো কেউ তাকে বুঝি ইলেকট্রিক শক দিয়েছে, তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়। নিঃশ্বাস আটকে আসে, সে কাঁপা গলায় বলে, "নড়ছে না, এখন আর নড়ছে না! আমি এখন পড়তে পারি! পড়তে পারি!

রাফি বলল, "তুমি যে অক্ষরটা দেখছ সেটা হচ্ছে পেটকাটা মূর্ধন্য ষ!"

"এইটা পেট কাটা মূর্ধন্য ষ? আমি কতবার শুনেছি এইটার কথা, কতবার দেখার চেষ্টা করেছি, দেখতে পারিনি!"

রাফি শারমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "এখন মনে হয় তুমি দেখতে পারবে, পড়তেও পারবে।"

ঈশিতা বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী হচ্ছে।"

রাফি বলল, "একটা অনেক বড় ব্যাপার ঘটেছে—আমরা মনে হয় শারমিনের ডিসলেক্সিয়ার সমস্যার সমাধান করে ফেলেছি!"

"কীভাবে? এই লাল প্লাস্টিক দিয়ে?"

"হ্যাঁ।" রাফি মাথা নাড়ল, "আমাদের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট প্রফেসর হাসান এই পদ্ধতিটার কথা বলেছিলেন। অনেক সময় দেখা গেছে, সাদার ওপর কালো লেখাটা হচ্ছে সমস্যা। লাল রঙের ওপর কালো লেখা হলে সমস্যা থাকে না। আমি ঠিক বিশ্বাস করিনি কাজ করবে! তবু ভাবলাম চেষ্টা করে দেখি। ভাগ্যিস চেষ্টা করেছিলাম, দেখাই যাচ্ছে কাজ করেছে।"

শারমিন তখন লাল প্লাস্টিকটা দিয়ে বইয়ের প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা পরীক্ষা করে দেখছে, উত্তেজনায় তার মুখ চকচক করছে। মনে হচ্ছে সে বুঝি সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে। ব্যাপারটা সে এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না। তার মনে হচ্ছে, একটু অসতর্ক হলেই হঠাৎ করে আবার বুঝি অক্ষরগুলো জীবন্ত পোকামাকড়ের মতো নড়তে শুরু করবে!

রাফি বলল, "শারমিন এখন তুমি পড়তে পারবে।"

শারমিন একটা অক্ষর দেখিয়ে বলল, "এগুলো কী অক্ষর?"

ঈশিতা উত্তর দিল, "বলল, প্রথমটা ক, তার পরেরটা হচ্ছে ল, তার পরেরটা হচ্ছে ম। তিনটা মিলে হচ্ছে কলম।"

আমার বই . কম
amarboi.com

শারমিন তার পরের শব্দটার দিকে আঙুল দিয়ে বলল, "তার মানে এটা হচ্ছে কমল?"

"ভেরি গুড। হ্যাঁ এটা হচ্ছে কমল। তার পরের শব্দটা হচ্ছে কমলা। ল-এর পর আকার থাকায় এটা হচ্ছে লা।"

শারমিন বইয়ে লেখা শব্দগুলো দেখিয়ে বলতে থাকে, "তার মানে এটা কাল? এটা লাল? এটা কলা? এটা কামাল? এটা মাকাল? এটা কালাম? এটা মালা? এটা কম? এটা মাল? এটা কাম? এটা মালা?"

ঈশিতা হেসে ফেলল। বলল, "আস্তে আস্তে! তিনটা অক্ষর আর আকার দিয়েই এত কিছু পড়ে ফেলতে পারছ, সবগুলো শিখে ফেললে কী হবে?"

রাফি বলল, "হ্যাঁ, এই বইটা ভারি চমৎকার, তিনটা অক্ষর আর আকার দিয়েই অনেক শব্দ শিখিয়ে দেয়!"

ঈশিতা বলল, "আমার ধারণা, পুরো ক্রেডিট বইটার না! আমাদের শারমিনকেও একটু ক্রেডিট দিতে হবে।"

"সে তো দিচ্ছিই!"

শারমিন লোভাতুর দৃষ্টিতে অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল। ঈশিতা তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি নাকি চোখের পলকে অনেক বড় বড় গুণ করে ফেলতে পারো?"

শারমিন লাজুক মুখে মাথা নাড়ল। ঈশিতা বলল, "বলো দেখি তেহাত্তরকে সাতানব্বই দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

শারমিন বলল, "সাত হাজার একাশি।"

ঈশিতা রাফির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিক হয়েছে?"

রাফি বলল, "শারমিন যখন বলেছে, নিশ্চয়ই ঠিক হয়েছে।"

ঈশিতা শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি কেমন করে এটা করো?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল "জানি না। আমি চিন্তা করলেই উত্তরটা জেনে যাই।"

"চিন্তা করলেই জেনে যাও?"

"হ্যাঁ। মনে হয় যেন দেখতে পাই।"

"দেখতে পাও? সংখ্যা দেখতে পাও?"

শারমিন লাজুক মুখে মাথা নাড়ল, বলল, "আমি তো লেখাপড়া জানি না, তাই কোন সংখ্যা দেখতে কেমন সেইটা জানি না! আমি নিজের মতন দেখি—কোনোটা গোল, কোনোটা লম্বা, কোনোটা চিকন, সেগুলো নড়ে।"

"কী আশ্চর্য!"

আমার বই কম
amarboi.com

শারমিন কিছু না বলে তার বর্ণমালার বই আর লাল প্লাস্টিকটা বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এর মধ্যে কোনটা আশ্চর্য সে এখনো বুঝতে পারছে না। রাফি বলল, "তুমি বলছ তুমি চিন্তা করলেই উত্তরটা জেনে যাও। তুমি কী চিন্তা করো?"

"গুণফলটা কী হবে সেটা চিন্তা করি।"

"তুমি মাথার মধ্যে গুণ করো না?"

"না। কেমন করে গুণ করতে হয় আমি জানি না।"

রাফি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখলেন ব্যাপারটা? শারমিন কেমন করে গুণ করতে হয় জানে না, কিন্তু গুণ না করেই যেকোনো দুটি সংখ্যার গুণফল বের করে ফেলে!"

"কেমন করে?"

"আমি যদি জানতাম!"

রাফি কথা বলতে বলতে টংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানে হঠাৎ করে অনেকেই চলে এসেছে, শারমিনের বাবা একা সামাল দিতে পারছে না।

রাফি শারমিনকে বলল, "তুমি এখন যাও। তোমার আব্বুকে সাহায্য করো।"

শারমিন তার বুকে চেপে রাখা বর্ণমালার বই আর লাল প্লাস্টিকটা দেখিয়ে বলল, "এই বইটা?"

"তোমার জন্য। তুমি নিয়ে যাও। বাসায় গিয়ে পড়ো। কাউকে বলো একটু দেখিয়ে দিতে। ঠিক আছে?"

শারমিন মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বলল না, কিন্তু তার চোখমুখ কৃতজ্ঞতায় ঝলমল করে উঠল। রাফি আগেও দেখেছে, এ দেশে মানুষেরা প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে "ধন্যবাদ" কথাটি উচ্চারণ করা শেখেনি, তাই চোখেমুখে সেটা প্রকাশ করতে হয়।

শারমিনের পিছু পিছু টংয়ে এসে রাফি দেখল, সেখানে একটা ছোটখাটো উত্তেজনা। উত্তেজনার কেন্দ্রস্থল সমীর—বায়োকেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের লেকচারার। রাফি গলা নামিয়ে ঈশিতাকে বলল, "ওই যে খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা ছেলেটাকে দেখছেন, সে হচ্ছে সমীর। কঠিন সায়েন্টিস্ট। সব সময় ব্যাক্টেরিয়া আর ভাইরাস নিয়ে কথা বলে ভয় দেখানোর চেষ্টা করে!"

ঈশিতা বলল, "ইন্টারেস্টিং!"

"হ্যাঁ। খুবই ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। চলেন গিয়ে শুনি আজকে কী নিয়ে কথা বলছে!"

আমার বই . কম
amarboi.com

রাফি ঈশিতাকে নিয়ে এগিয়ে গেল, টংয়ের বেঞ্চে সমীর বসে আছে। সে হাত নেড়ে কথা বলছে এবং তাকে ঘিরে একটু জটলা। সবার মুখেই এক ধরনের হাসি, কেউ সেটা গোপন করার চেষ্টা করছে, কেউ করছে না। সমীর গলা উঁচিয়ে বলল, "তোমরা হাসছ? আমার কথা শুনে তোমরা হাসছ?"

একজন তার মুখের হাসিকে আরও বিস্তৃত করে বলল, "কে বলল আমি হাসছি? মোটেই হাসছি না।"

"তোমরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? তোমরা ভাবছ, আমি শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছি?"

আরেকজন বলল, "না সমীর! আমরা মোটেও সেটা ভাবছি না। আমরা সবাই জানি তুমি খুবই সিরিয়াস মানুষ।"

সমীর বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে তোমরা আজকের খবরের কাগজ দেখো। টিঅ্যান্ডটি বস্তি থেকে দশটা বাচ্চাকে মেডিকেলে নিয়েছে—পাঁচজনের ব্রেন হেমারেজ। একজন অলরেডি ডেড। একজন ডিপ কোমায়। ডু ইউ থিংক—এগুলো এমনি এমনি হচ্ছে?"

রাফি জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে হচ্ছে?"

"ভাইরাস অ্যাটাক। আমি বলেছিলাম খুব খারাপ একটা ভাইরাস এসেছে। আমাদের দেশের জন্য ডেঞ্জারাস। যে সিম্পটমগুলো পড়েছি সেগুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে। কেউ নজর দিচ্ছে না। মিডিয়ার অনেক সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার।"

রাফি ঈশিতাকে দেখিয়ে বলল, "সমীর, এর নাম ঈশিতা। খবরের কাগজের লোক। ওকে ভালো করে বুঝিয়ে দাও—খবরের কাগজে ফাটাফাটি রিপোর্টিং করে দেবে।"

সমীর ভুরু কুঁচকে বলল, "আপনি সাংবাদিক?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনারা চুপচাপ বসে আছেন কেন? কেউ কিছু বোঝার আগেই তো সব সাফ হয়ে যাবে। কী ডেঞ্জারাস ভাইরাস আপনি জানেন?"

ঈশিতা ইতস্তত করে বলল, "আমরা কী করব?"

"সত্যি কথাটা জানাবেন। সবাইকে বলবেন বাংলাদেশ এখন ভীষণ একটা বিপদের মধ্যে আছে। টিঅ্যান্ডটি বস্তির বাচ্চাগুলো কোনো র‍্যান্ডম অসুখে অসুস্থ হয়নি। তারা সেই ভাইরাসে ইনফেক্টেড। এ মুহূর্তে যদি কোয়ারেন্টাইন করে প্রটেকশন না দেওয়া হয়, সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

ঈশিতা তার পকেট থেকে একটা নোট বই বের করে বলল, "ভাইরাসটার নাম কী?"

"এখনো ফরমাল নাম দেয়নি। এটাকে বলছে এফটি টুয়েন্টি সিক্স। আপনাকে আমি ওয়েব লিংক দিতে পারি, সব ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন।"

"ভেরি গুড। আমি কি আপনাকে রেফারেন্স দিয়ে রিপোর্ট করতে পারি?"

সমীর হা হা করে হাসল। সে যে হাসতে পারে সেটা অনেকেই জানত না, তাই আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকেই একটু অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। সমীর যেভাবে হাসিটা হঠাৎ করে শুরু করেছিল, ঠিক সেভাবে হঠাৎ করে থামিয়ে বলল, "আমি মফস্বলের একটা ইউনিভার্সিটির ফালতু একটা লেকচারার। আমার রেফারেন্স দিয়ে কী লাভ? কে আমার কথা বিশ্বাস করবে? আমার কলিগরাই বিশ্বাস করছে না, আর দেশের পাবলিক বিশ্বাস করবে?"

ঈশিতা বলল, "বিশ্বাস করা না করা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না! আপনি যখন প্রথম এই কথাটা বলছেন, সেটা ডকুমেন্টেড থাকুক। যদি দেখা যায় আসলেই আপনার আশঙ্কা সত্যি, তাহলে আপনার ক্রেডিবিলিটি এস্টাবলিশড হবে!"

সমীর মুখ গম্ভীর করে বলল, "ঠিক আছে!"

ঈশিতা ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে বলল, "আপনার কয়েকটা ছবি তুলি?"

"তুলবেন? তুলেন।"

সমীরকে ঘিরে দাঁড়ানো সবাই তাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করতে লাগল এবং তার মধ্যে ঈশিতা তার ক্যামেরা দিয়ে খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে অনেকগুলো ছবি তুলে ফেলল। ছবি তোলা শেষ করে ঈশিতা তার নোট বই নিয়ে সমীরের পাশে বসে তার সঙ্গে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা বলে। এত দিন পর সত্যিকারের একজন শ্রোতা পেয়ে সমীর টানা কথা বলে যেতে থাকে। তাকে দেখে মন হয়, সে বুঝি নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্যও একটু বিরতি দেবে না!

দুই দিন পর খবরের কাগজে সমীরের ভাইরাস এফটি টুয়েন্টি সিক্সের ওপর বিশাল প্রতিবেদন বের হলো। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সমীরের ছবি। ঈশিতা খুব গুছিয়ে রিপোর্টিং করেছে, সারা দিন সমীরের কাছে টেলিফোন এল, বিকেলের দিকে একটা টেলিভিশন চ্যানেল পর্যন্ত চলে এল।

পরদিন ভোরে রাফি ক্লাসে যাওয়ার জন্য তার লেকচার ঠিক করছে, তখন সমীর এসে হাজির। তার উসকোখুসকো চুল, চোখের নিচে কালি এবং শুকনো মুখ। রাফি অবাক হয়ে বলল, "কী হয়েছে সমীর?"

amarboi.com

সমীর জিব দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজানোর চেষ্টা করে নিচু গলায় বলল, "দরজাটা বন্ধ করি?"

"দরজা বন্ধ করবে?" রাফি কারণটা জানতে চাইতে গিয়ে থেমে গিয়ে বলল, "করো।"

সমীর দরজা বন্ধ করে রাফির খুব কাছাকাছি এসে বসে ভাঙা গলায় বলল, "আমি খুব বিপদে পড়েছি।"

"কী বিপদ?"

"গতকাল এফটি টুয়েন্টি সিক্সের খবর বের হয়েছে—"

"হ্যাঁ দেখেছি। চমৎকার রিপোর্টিং—"

"চমৎকারের খেতা পুড়ি।"

"কেন, কী হয়েছে?"

"রাতে এগারোটার সময় আমার বাসায় দুজন লোক এসেছে। লম্বা-চওড়া, চুল ছোট করে ছাঁটা। একজন মাঝবয়সী, আরেকজন একটু কম। দুজনেরই সাফারি কোট। এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, এই বাসায় আর কে

থাকে? আমি বললাম, আর কেউ থাকে না। তখন লোকগুলো দুইটা চেয়ারে বসল। একজন পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে টেবিলে রাখল।"

রাফি চমকে উঠে বলল, "পিস্তল?"

"হ্যাঁ। আরেকজন আমাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে আমার ঘাড়ে একটা হাত দিয়ে বলল, "মালাউনের বাচ্চা, তুমি তোমার বাপের দেশে না গিয়ে এই দেশে পড়ে আছো কেন?"

"আমি বললাম, এইটাই আমার বাপদাদা চৌদ্দগুষ্টির দেশ। তখন লোকটা রিভলবারটা হাতে নিয়ে আমার কপালে ধরে বলল, এইটা যদি তোমার বাপের দেশ হয় তাহলে এই দেশের নিয়ম মেনে চলতে হবে। আমি বললাম, এই দেশের নিয়ম কী? লোকটা বলল, বেদরকারি কথা বলবা না। আমি বললাম, বেদরকারি কথাটা কী? লোকটা বলল, ভাইরাসের কথাটা হচ্ছে বেদরকারি, ফালতু কথা। খামোখা মানুষকে ভয় দেখানোর কথা।"

সমীর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার তখন ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে, তবু সাহস করে বললাম, এটা ফালতু কথা না। এটা খুবই ডেঞ্জারাস কথা। লোকটা তখন রিভলবারের নল দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে বলল, চোপ ব্যাটা মালাউন। আমি যদি বলি এটা ফালতু, তাহলে এটা ফালতু। বুঝেছিস?"

আমার বই . কম
amarboi.com

কথাগুলো বলতে বলতে সমীরের মুখ শক্ত হয়ে যায়। সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তখন আমার মাথার মগজে রক্ত উঠে গেল। আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললাম, গেট আউট। গেট আউট আমার বাসা থেকে।" লোক দুইটা তখন কেমন যেন হকচকিয়ে গেল, ওরা বুঝতে পারে নাই আমি এইভাবে রেগে উঠব। ওরা ভেবেছে আমাকে ভয় দেখালে আমি ভয়ে কেঁচো হয়ে থাকব।"

রাফি একটু ঝুঁকে বলল, "তারপর কী হলো?"

লোক দুইটা তখন উঠে দাঁড়াল, যেইটা একটু বয়স্ক সেইটা বলল, "শোনো ছেলে। এই ভাইরাস নিয়ে যদি আর একটা কথা বলো তাহলে তোমার লাশ পড়ে যাবে। খোদার কসম।"

"তুমি কী বললে?"

"আমি বললাম, আমার যদি বলার ইচ্ছা করে তাহলে আমি একশবার বলব। তোমার যদি ক্ষমতা থাকে লাশ ফেলে দেওয়ার, লাশ ফেলে দিয়ো। আমি ভয় পাই না! যদিও বলেছি ভয় পাই না—কিন্তু আসলে ভয়ে আমার

হার্টফেল করার অবস্থা! মনে হয় অনেক জোরে চিৎকার করেছি। পাশের ফ্ল্যাট থেকে তখন কবির ভাই এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?

"আমি তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম, কবির ভাই ঢুকে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে? লোকটা ততক্ষণে রিভলবারটা লুকিয়ে ফেলেছে। সে বলল, কিছু হয় নাই। তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। কবির ভাই জানতে চইল, কী ব্যাপার। আমি কিছু বললাম না। কবির ভাই তখন আমাকে ঘাঁটাল না।"

সমীর কিছুক্ষণ মুখ শক্ত করে রেখে বলল, "সকালবেলা তোমার কাছে এলাম, আমার সেই ঈশিতা মেয়েটার সঙ্গে একটু পরামর্শ করা দরকার। তোমার সঙ্গেও বলি। কী করব বুঝতে পারছি না।"

"এরা কারা?"

"জানি না। রাতে বাসার সামনে বিশাল একটা গাড়িতে অনেকক্ষণ বসে থাকল। কোনো লুকোছাপা নেই, মনে হয় সরকারি লোক।"

"সরকারি লোক এ রকম করবে কেন? তোমাকে মালাউন ডাকবে কেন?"

সমীর হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাদের অনেকেই মালাউন ডাকে, তোমরা সেটা জানো না! যাই হোক, ঈশিতার নম্বরটা দাও, না হলে ফোন করে আমাকে লাগিয়ে দাও।"

আমারবই.কম
amarboi.com

রাফি ঈশিতাকে ফোন করল, সেখানে একটা ইংরেজি গান রিংটোন। কিন্তু কেউ ফোন ধরল না। কিছুক্ষণের ভেতর একটা অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন এল, ফোন ধরতেই ঈশিতার গলা শোনা গেল, "রাফি?"

"হ্যাঁ। এখানে একটা ব্যাপার ঘটেছে।"

"জানি।"

"জানো?"

"হ্যাঁ। আমি আমার ফোনে ধরিনি। এটা ট্যাপ করছে। অন্য নম্বর থেকে ফোন করছি। সমীর কেমন আছে?"

"সমীরের কথাই বলছিলাম। কাল রাতে দুজন লোক—"

"জানি। ওরা অসম্ভব ডেঞ্জারাস, আমি ফোনে সবকিছু বলতে পারব না। সমীরকে বোলো সাবধানে থাকতে। আজকে ভাইরাসের ওপর ফলোআপ নিউজ থাকার কথা ছিল, আমরা ড্রপ করেছি। সমীরকে বোলো কারও সঙ্গে কোনো কথা না বলতে।"

"সমীর এখানে আছে, তুমি কথা বলো।"

সমীর কিছুক্ষণ ঈশিতার সঙ্গে কথা বলল। বেশির ভাগ সময় অবশ্যি কথা শুনল, হুঁ হাঁ করল, নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর ফোনটা রাফির হাতে ফিরিয়ে দিল। রাফি ফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, "ঈশিতা।"

"হ্যাঁ। বলো।"

"এখন অন্য ঝামেলা শুরু হয়ে গেল, তাই বলার জন্য ঠিক সময় কি না বুঝতে পারছি না। মনে আছে, তুমি নিউরাল কম্পিউটার নিয়ে জানতে চাইছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আমি ফ্যান্টাস্টিক রিসোর্স পেয়েছি। তুমি বিশ্বাস করবে না। পৃথিবীর সেরা নিউরাল কম্পিউটার ফার্ম বাংলাদেশে অফিস খুলেছে। কোম্পানির নাম এনডেভার, টঙ্গীতে অফিস। ওয়েবসাইটটা চমৎকার ফ্রেন্ডলি। ওদের অফিসে গেলে—"

ঈশিতা বলল, "রাফি।"

গলার স্বরে কিছু একটা ছিল। রাফি থতমত খেয়ে থেমে গেল। ঈশিতা ঠান্ডা গলায় বলল, "আমি এনডেভারে গিয়েছিলাম। সে জন্যই নিউরাল কম্পিউটার সম্পর্কে জানতে চাইছি। যে দুজন লোক সমীরকে ভয় দেখিয়েছে, সেই দুজন আমাকেও ভয় দেখিয়েছে, আমি যেন এনডেভারের ওপর রিপোর্টিং না করি।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"কেন?"

"জানি না। শুধু এটুকু জেনে রাখো, টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে যারা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, তাদের সবার চিকিৎসা করছে এনডেভার।"

"সত্যি? কেন?"

"আমারও সেই একই প্রশ্ন। কেন?"

"কোথায় চিকিৎসা হচ্ছে?"

"ওদের বিল্ডিংয়ে।"

রাফি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "ওদের বিল্ডিংয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে?"

"হ্যাঁ। সেখানে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

"কেন?"

"জানি না। শুধু মনে হচ্ছে, এনডেভার আগে থেকে জানত, এখানে এফটি টুয়েন্টি সিক্সের ইনফেকশন হবে!"

রাফি অবাক হয়ে বলল, "কেমন করে জানত?"

"শুধু একভাবে সম্ভব।"

"কীভাবে?"

"যদি নিজেরাই সেই ভাইরাসটা ছড়িয়ে থাকে।"

"কী বলছ?"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "রাফি তুমি আমাকে কথা দাও, আমি যে কথাগুলো বলেছি, তুমি সেগুলো কাউকে বলবে না।"

রাফি বলল, "বলব না।"

"আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করো।"

"টেলিফোনে গা ছোঁয়া যায় না।"

"জানি। তাতে কিছু আসে যায় না, প্রতিজ্ঞা করো।"

"করলাম।"

"যদি দেখো আমাকে মেরে ফেলেছে, তাহলে তুমি কোথা থেকে অগ্রসর হবে, সেটা জানিয়ে রাখলাম।"

"তোমাকে মেরে ফেলবে কেন?"

"বলিনি মেরে ফেলবে, বলেছি যদি মেরে ফেলে।"

"যদির কথাটি কেন আসছে?"

"জানি না, রাফি।"

আমার বই . কম
amarboi.com

রাফি হঠাৎ করে একটা অশুভ আশঙ্কা অনুভব করে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সাবধানে থেকো ঈশিতা।"

রাফির হঠাৎ মনে পড়ল, সে ঈশিতার সঙ্গে আপনি করে কথা বলত। কখন কীভাবে সেটা তুমি হয়ে গেছে, জানে না। ঈশিতাও সেটা লক্ষ করেছে বলে মনে হলো না। সেও খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, "চিন্তা কোরো না রাফি। আমি সাবধানে থাকব।"

৫.

ঈশিতা অবশ্যি মোটেই সাবধানে থাকল না। সে পরদিন তার ক্যামেরা নিয়ে টিঅ্যান্ডটি কলোনিতে হাজির হলো। মুখে কাপড়ের একটা মাস্ক লাগিয়ে নিয়েছিল এবং আশা করতে লাগল, এনডেভারের লোকজন যেন তাকে না চেনে।

সেখানে আরও কয়েকজন সাংবাদিক ছিল, তারাও মুখে মাস্ক লাগিয়েছে। তারা লাগিয়েছে অন্য কারণে, ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে। বড় একটা টেলিভিশন ক্যামেরা ঘাড়ে নিয়ে একজন গজগজ করতে করতে ঈশিতাকে বলল, "ক্যামেরাম্যানের চাকরির খেতা পুড়ি।"

ঈশিতা বলল, "কেন, কী হয়েছে?"

"কোনো দিন টেলিভিশনে আমাদের চেহারা দেখায়? দেখায় না।"

"কেন দেখাবে? দেখানোর কথা না, আর দেখাবে না জেনেই তো চাকরিটা নিয়েছেন।"

"সেটা সত্যি। কিন্তু তাই বলে জীবনের সিকিউরিটি দেবে না? অজায়গা কুজায়গায় পাঠিয়ে দেয়, একশবার বলে দেয়, তোমার জান গেলে যাক, ক্যামেরার যেন ক্ষতি না হয়।"

ঈশিতা কিছু না বলে একটু হাসল, মুখের মাঝে মাস্ক লাগানো, তাই সেই হাসিটা ক্যামেরাম্যান অবশ্যি দেখতে পেল না। ক্যামেরাম্যান বলল, "এখানে প্লেগ নাকি এইডস—কী সমাচার কিছু জানি না। পাঠিয়ে দিল, ফুটেজ নিতে হবে। এখন যদি মারা যাই?"

ঈশিতা বলল, "ভয় নাই, মারা যাবেন না। এটা পানিবাহিত, আপনার মুখের ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কিছু খাবেন না। বাসায় গিয়ে সাবান দিয়ে গোসল করে নেবেন।"

আমার বই.কম
amarboi.com

"ব্যাটা জীবাণু জানে তো যে সে পানিবাহিত? তার শুধু মুখ দিয়ে যাওয়ার কথা? যদি মাইন্ড চেঞ্জ করে বাতাসবাহিত হয়ে নাক দিয়ে ঢুকে যায়?"

ঈশিতা আবার একটু হাসল, কিন্তু ক্যামেরাম্যান হাসিটা দেখতে পাবে না বলে মুখে বলল, "না, এই ভাইরাস মাইন্ড চেঞ্জ করবে না। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

কথা বলতে বলতে ঈশিতা একটু দূরে তাকিয়ে ছিল। বস্তির ছোট রাস্তাটার কাছাকাছি অনেক অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাম্বুলেন্সের ওপর লালবাতি জ্বলছে ও নিভছে। লালবাতি জ্বলা আর নেভার কথাটা কে প্রথম চিন্তা করে বের করেছিল কে জানে, কিন্তু এই জ্বলা ও নেভা বাতিগুলো নিঃসন্দেহে পুরো এলাকায় একটা আতঙ্ক ছড়িয়ে দেয়। ঈশিতা দূর থেকে লক্ষ করে, ধবধবে সাদা পোশাক পরা মানুষজন স্ট্রেচারে করে নানা বয়সী মানুষকে আনছে। আত্মীয়স্বজন তাদের ঘিরে থাকার চেষ্টা করছে, কিন্তু কেউ তাদের কাছে আসতে দিচ্ছে না। অ্যাম্বুলেন্সগুলো বিশেষভাবে তৈরি। একসঙ্গে বেশ কয়েকটা স্ট্রেচার সেখানে ঢোকানো যায়। স্ট্রেচারগুলো ঢোকানোর পর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হলো। একটা একটা অ্যাম্বুলেন্স যখন ছেড়ে দিতে শুরু করেছে, তখন হঠাৎ করে খানিকটা উত্তেজনা দেখা গেল। মনে হলো, উত্তপ্ত গলায় কথা-কাটাকাটি হচ্ছে। একজন মহিলার কাতর গলার স্বর আর্তনাদের মতো শোনা যেতে থাকে। সাদা কাপড় পরা মানুষগুলোকে বস্তির মানুষেরা ঘিরে ফেলেছে এবং তার ভেতর থেকে একজন মহিলার কান্না শোনা যেতে থাকে।

আমার বই.কম
amarboi.com

ক্যামেরাম্যান তার ক্যামেরা নিয়ে সেদিকেই ছুটে যায়। ঈশিতা দেখল, কয়েকজন মানুষ তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। ভিড় একটু বেড়ে যাওয়ার পর ঈশিতাও মানুষজনের সঙ্গে মিশে গিয়ে কাছাকাছি এগিয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্সের কাছাকাছি একজন মাঝবয়সী মহিলা ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে চিৎকার করছে এবং কয়েকজন তাকে থামানোর চেষ্টা করছে। মহিলাটি কী বলছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। ঈশিতা তাই তার পাশের মানুষটিকে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ভাই?"

"হাজেরার ছেলেরে খুঁজে পাচ্ছে না।"

"হাজেরা?" ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "এই মহিলা হচ্ছেন হাজেরা?"

"হ।"

"কেন খুঁজে পাচ্ছে না?"

"গত পরশু অ্যাম্বুলেন্সে করে নিছিল। এখন কুনোখানে নাই।"

"তাই নাকি?"

"হ। হাজেরা তো তাই বইলছে।"

বিষয়টা শোনার পর ঘটনাটা বোঝা ঈশিতার জন্য সহজ হলো। সে দেখল, হাজেরা নামের মহিলাটা প্রায় বাঘের মতো সাদা পোশাক পরা মানুষগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর চিৎকার করে বলছে, "কই? আমার ছেলে কই? তুমরা পরশু দিন নিয়া গেছ।"

সাদা পোশাক পরা মাঝবয়সী একজন মানুষ বলল, "আমরা কেমন করে বলব তোমার ছেলে কোথায়?"

"পরশু দিন এই অ্যাম্বুলেন্সে করে নিছ।"

"নিয়ে থাকলে হাসপাতালে আছে।"

"নাই। আমি গিয়ে দেখেছি। অন্যরা আছে, কিন্তু আমার ছেলে নাই।"

"তাহলে অন্য কোথাও আছে।"

"আমি সব জায়গা খুঁজছি। মেডিকেল গেছি, কোথাও নাই।"

"না থাকলে আমরা কী করব?"

"তোমরা নিয়েছ, কোথায় নিয়েছ বলো।" হাজেরা নামের মহিলাটা চিৎকার করে উঠল, "কোথায় নিয়েছ? কোথায়?"

আমার বই . কম
amarboi.com

ঠিক এ রকম সময় কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে এল। তারা রাইফেলের বাঁট দিয়ে ধাক্কা মেরে সবাইকে সরিয়ে দেয়, চিৎকার করে বলে, "সরে যাও। সবাই সরে যাও। অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে যেতে দাও।"

সাদা পোশাক পরা মানুষগুলো ঝটপট অ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়ে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাইরেন বাজাতে বাজাতে সেগুলো চলতে শুরু করে। হাজেরা অ্যাম্বুলেন্সের পেছন পেছন ছুটে যেতে চেষ্টা করল। দুজন পুলিশ তাকে থামাল।

হাজেরা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মানুষের মতো চিৎকার করতে থাকে। তখন একজন পুলিশ প্রচণ্ড জোরে তাকে ধমক দেয়, "পেয়েছটা কী? মাতলামির জায়গা পাও না? সরকারি কাজে ডিস্টার্ব করো?"

হাজেরা আকুল হয়ে কেঁদে বলল, "আমার ছেলে—"

"তোমার ছেলে? তোমার ছেলের খোঁজ রাখবে তুমি।"

"আমার ছেলেকে—"

"মাস্তানি গুন্ডামি করে তোমার ছেলে কী করেছে, সেই খোঁজ রাখতে পারো না।"

"মাস্তানি গুন্ডামি করে নাই—"

"খবরদার। আর একটা কথা বলেছ কি সরাসরি চুয়ান্ন ধারায় বুক করে দেব।" পুলিশদের একজন তখন উপস্থিত সবার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, "কী হচ্ছে? তামাশা দেখছ? যাও, সবাই যাও। নিজের নিজের কাজে যাও।"

মানুষগুলো তখন সরে যেতে থাকে।

ঈশিতা একটু দূরে সরে গিয়ে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে। যখন মানুষগুলো সরে ভিড়টা হালকা হয়ে আসে, তখন সে নিঃশব্দে হাজেরার কাছে গিয়ে বলল, "এই যে শুনেন।"

হাজেরা ঘুরে তাকাল, চোখের দৃষ্টি শূন্য। ঈশিতা বলল, "আমি একজন সাংবাদিক। আপনার কথা শুনেছি আমি। আমাকে কি একেবারে ঠিক করে বলতে পারবেন, কবে, কখন, কোন অ্যাম্বুলেন্সে আপনার ছেলেকে নিয়েছে? সঙ্গে আর কে ছিল? অ্যাম্বুলেন্সের মানুষগুলোর চেহারা কী রকম?"

হাজেরা কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর অনেকটা হিংস্র গলায় বলল, "পরশু দিন দুপুরবেলা। একটা না হয় দুইটা বাজে। অনেক অ্যাম্বুলেন্স এসেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে পিছনের অ্যাম্বুলেন্সে তুলেছে। একজন বিদেশি ছিল। সাদা চামড়া নীল চোখ।"

"আপনার ছেলের নাম কী?"

"মকবুল।"

"বয়স?"

"বারো।"

"আপনার কাছে মকবুলের ছবি আছে?"

"বাসায় আছে।"

"আমাকে একটু দেখাতে পারবেন?"

"আসেন আমার সাথে।"

ঈশিতা হাজেরার সঙ্গে তার বাড়িতে গেল। ঘুপচি গলির পাশে গায়ে গায়ে লাগানো চালাঘর। তার একটার তালা খুলে হাজেরা ভেতরে ঢুকে একটু পর বের হয়ে আসে। স্টুডিওতে তোলা ছবি, দশ-বারো বছরের শুকনো একটা ছেলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে স্ক্রিনে আঁকা নদী-গাছ-পাখি এবং একটি প্রাসাদের দৃশ্য। ঈশিতা বলল, "আমি এটার একটা ছবি তুলে নিই?"

হাজেরা মাথা নাড়ল। ঈশিতা তার ক্যামেরা দিয়ে মকবুলের ছবিটার একটা ছবি তুলে নেয়। ছবিটা হাজেরাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার ছেলে অসুস্থ হলো কেমন করে, জানেন?"

"না। জানি না।"

"গত এক সপ্তাহে আপনার ছেলে কি অস্বাভাবিক কিছু করেছে?"

"না। করে নাই।"

"কিছু খেয়েছে?"

"না, খায় নাই।"

"কোনো ওষুধ—"

"এনজিওর আপারা সব বাচ্চাকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ভাইটামিন খেতে দিল—"

ঈশিতা চমকে ওঠে। "ভাইটামিন?"

"হ্যাঁ।"

"আছে সেই ভাইটামিন?"

"আছে।"

"দেখাবেন আমাকে?"

আমার বই . কম
amarboi.com

হাজেরা আবার ভেতরে ঢুকে একটা ভিটামিনের শিশি নিয়ে ফিরে আসে। ঈশিতা শিশিটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে। বিদেশি দামি ভাইটামিন। ক্যামেরা বের করে সে ভাইটামিনের শিশিটার ছবি তুলে ফেরত দিয়ে বলল, "এর ভেতর থেকে আমি একটা ভাইটামিনের ট্যাবলেট নিতে পারি?"

"নেন।"

ঈশিতা শিশি খুলে একটা ভাইটামিনের ক্যাপসুল বের করে কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে জিজ্ঞেস করল, "এই ক্যাপসুল ছাড়া মকবুল আর কিছু খেয়েছে?"

"ছোট মানুষ, সব সময়ই তো এইটা সেইটা খায়। বাদাম, আমড়া, আচার—"

"অন্য কিছু? এনজিওর আপারা কি আর কিছু খেতে দিয়েছিল?"

হাজেরা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "দিতে পারে। মনে নাই।"

"কোন এনজিও, জানেন?"

"না, জানি না।"

ঈশিতা বলল, "ঠিক আছে, তাহলে আমি আসি।"

হাজেরা ভাঙা গলায় বলল, "আমি কি মকবুলরে খুঁজে পামু?"

"পাবেন। নিশ্চয়ই পাবেন। আস্ত একজন মানুষ তো আর হারিয়ে যেতে পারে না। আমিও খোঁজ নেব। কোনো খোঁজ পেলে আমি আপনাকে জানাব।"

"আল্লাহ আপনার ভালো করুক।"

ঈশিতা চলে যেতে যেতে আবার ফিরে এল। বলল, "আর শোনেন।"

"জে।"

"মকবুলের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি খুব বেশি মানুষকে কিছু বলবেন না।"

"কেন?"

"আমি জানি না। কিন্তু, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"আমার কেন জানি মনে হয়, এ বিষয়টা নিয়ে আপনি যত হইচই করবেন, আপনার ওপর তত বড় একটা বিপদ আসবে।"

হাজেরা তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল। বলল, "আপনি কেন এ কথা বলছেন?"

ঈশিতা বলল, "আমি জানি না। ঠিক করে জানি না। কিন্তু—" ঈশিতা তার বাক্যটা শেষ করতে পারল না।

আমারবই.কম
amarboi.com

ঈশিতা ঘুপচি গলি দিয়ে বের হতে হতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, গলির মুখে সাফারি কোট পরা কঠোর চেহারার দুজন মানুষ। এই মানুষগুলোকে সে আগে দেখেছে, এরাই তাদের অফিসে এসেছিল। এরা এখন কাউকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছে। কী জিজ্ঞেস করছে ঈশিতা বুঝে গেল। এরা হাজেরার বাসাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। ঈশিতা দ্রুত পাশের গলিতে ঢুকে যায়। মানুষ দুজন এখানে তাকে দেখতে পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, তার আর হাজেরার দুজনেরই।

ঈশিতা বাকি দিনটুকু খোঁজখবর নিয়ে কাটাল। হাজেরার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে মকবুলকে এনডেভারের ভেতরেই নেওয়া হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্সগুলো সারি বেঁধে এনডেভারে ঢুকেছে, কোনোটা অন্য কোথাও যায়নি। কাজেই মকবুল নিশ্চয়ই এনডেভারের ভেতরই আছে। অন্য সবার মেডিকেল রিপোর্ট দিয়েছে, মকবুলের রিপোর্ট নেই। শুধু যে রিপোর্ট নেই তা নয়, তার কোনো হদিসই নেই।

যাদের রিপোর্ট দেওয়া হচ্ছে, তাদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগ বিপদমুক্ত—কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তাদের শরীরে এই ভাইরাসের

প্রতিষেধক আছে, ভাইরাসের আক্রমণের পর প্রথম কয়েক দিন জ্বর, মাথাব্যথা এ রকম খানিকটা উপসর্গ দেখা গেছে। তারপর নিজে নিজেই সেরে উঠতে শুরু করেছে। দ্বিতীয় ভাগের মস্তিষ্কে এক ধরনের প্রদাহ শুরু হয়েছে, সেটা কতটুকু গুরুতর হবে, কেউ জানে না। যারা আক্রান্ত হয়েছে, তারা অমানুষিক যন্ত্রণায় ছটফট করছে। শুধু তা-ই নয়, নানা ধরনের বিভ্রমে ভুগছে। তাদের বেশির ভাগকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে। ভাইরাসের কোনো সহজ চিকিৎসা নেই বলে সবাই অপেক্ষা করছে—শরীর নিজে থেকে যদি সেরে ওঠে তার অপেক্ষায়। তৃতীয় ভাগের অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ—তারা সবাই গভীর কোমায়। এই গভীর কোমা থেকে বের হয়ে আসতে পারবে কী পারবে না, কেউ জানে না।

ঈশিতা পরদিন হাজেরার সাথে দেখা করতে গেল। বস্তির ভেতরে ঢোকার আগেই সে অনুমান করে সেখানে কিছু একটা হয়েছে। হাজেরার ঘরের কাছাকাছি এসে বুঝতে, পারল যেটা হয়েছে সেটা হাজেরাকে নিয়ে। তার ঘরের সামনে পুলিশ এবং অনেক মানুষের ভিড়। পুলিশ মানুষগুলোকে সরিয়ে রেখেছে এবং কয়েকজন ধরাধরি করে হাজেরার মৃতদেহটি বের করে আনছে। গত রাতে সে বিষ খেয়ে মারা গেছে।

আমার বই . কম
amarboi.com

ঈশিতা কোনো কৌতূহল দেখাল না, কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে তার ভেতরটা আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে আছে। তাকে কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু সে জানে, হাজেরা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেনি, তাকে মেরে ফেলা হয়েছে। ঈশিতা এটিও জানে, হতদরিদ্র হাজেরার ঘর থেকে খোয়া যাওয়ার মতো মূল্যবান কিছু নেই, কিন্তু তার পরও সেখান থেকে অন্তত একটি জিনিস নিশ্চয়ই খোয়া গেছে। সেটা হচ্ছে হাজেরার ছেলে মকবুলের একটি ফটো।

বেশির ভাগ মানুষই লক্ষ করেনি, পরদিন বেশ কয়েকটি খবরের কাগজে হাজেরার মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছিল। তার মাদকাসক্ত ছেলে মকবুলের দৌরাত্ম্যে নিরুপায় হয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। মকবুল বাড়ি থেকে পালিয়েছে অনেক দিন, সে কথাটিও খবরে লেখা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সে অপরাধী চক্রের সঙ্গে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা আছে। কোথাও লেখা নেই, মকবুলের বয়স মাত্র বারো। কোথাও লেখা নেই, সে ছিল হাসিখুশি শিশু, মায়ের আদরের ধন।

দেশের প্রায় সব মানুষই লক্ষ করেছিল, সে রকম আরও একটি খবর সেদিন খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য নতুন

একটি এলগরিদম এনডেভার প্রথমবারের মতো পরীক্ষা করে দেখেছে। তাদের নিউরাল কম্পিউটারে সেই এলগরিদম একটি মাইলফলক সৃষ্টি করেছে। এনডেভার খুব গর্ব করে বলেছে যে বাংলাদেশের মানুষ শুনে খুব আনন্দ পাবে যে এই মাইলফলকটি স্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশে, এই নিউরাল কম্পিউটারটিও তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। এনডেভার বাংলাদেশের জনগণ, তাদের মেধাবী জনগোষ্ঠী এবং সরকারের আন্তরিক সহযোগিতার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।

ঈশিতা খবরের কাগজের দুটি খবরের দিকেই দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। সে বুঝতে পারল, তার ভেতর একটা অসহ্য ক্রোধ পাক খেয়ে উঠছে। অসহায় ক্রোধ, তাই সেটি ছিল ভয়ংকর।

মানুষটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমি কী করব?"

"আপনি আপনার টিমের সঙ্গে আমাকে নিয়ে যাবেন।"

মানুষটা কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "আ-আমি, আমার টিমের সঙ্গে আপনাকে নিয়ে যাব?"

আমার বই . কম
amarboi.com

"হ্যাঁ।"

মানুষটা বলল, "আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, আপনি আমাদের এমপ্লয়ি না, অথচ আপনাকে আমি টিমের সঙ্গে নিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ। আমি সেটাই অনুরোধ করছি।" ঈশিতা জোর করে একটু হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমার অনুরোধ রাখা, না-রাখা আপনার ইচ্ছা।"

মানুষটা কিছুক্ষণ ঈশিতার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আপনার অনুরোধটা যে বেআইনি, আপনি সেটা জানেন?"

"জানি।"

"আপনি কি কখনো কাউকে ছিনতাই করতে বলেছেন? চুরি, ডাকাতি কিংবা মার্ডার করতে?"

"না, বলিনি।"

"কিন্তু আমাকে একটা বড় ধরনের অপরাধ করতে বলেছেন? এর কারণে আমার চাকরি চলে যেতে পারে। আমার কোম্পানির লাল বাতি জ্বলতে পারে কিংবা—" মানুষটি তার বাক্য শেষ না করেই থেমে গেল।

ঈশিতা বলল, "কিংবা—"

"আমি যদি পুলিশ-র‍্যাবকে খবর দিই, আপনি বড় ধরনের আইনি ঝামেলায় পড়ে যেতে পারেন।"

ঈশিতা হাসির ভঙ্গি করল। বলল, "আপনি খবর দেবেন না।" মানুষটি অবাক হয়ে বলল, "আমি খবর দেব না?"

"না। আপনি যদি সবকিছু শোনেন, তাহলে আপনি কখনোই পুলিশ আর র‍্যাবকে খবর দেবেন না।"

মানুষটা বলল, "শুনি আপনার সবকিছু।"

ঈশিতা তার পকেট থেকে মকবুলের ছবিটি বের করে মানুষটির হাতে দিয়ে বলল, "এই ছেলেটাকে দেখে আপনার কী মনে হয়?"

মানুষটা ছবিটি দেখে বলল, "একটা ছেলে। গরিব ঘরের ছেলে। বয়স নয়-দশ বছর।"

"কারেক্ট। তবে ছেলেটার বয়স বারো। টিঅ্যান্ডটি বস্তিতে ভাইরাস অ্যাটাকে যারা অসুস্থ হয়েছিল, তার মধ্যে এই ছেলেটাও ছিল। এনডেভারের অ্যাম্বুলেন্স তাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু—"

"কিন্তু?"

"ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে। তার মা হাজেরা বেগম সেটা নিয়ে হইচই করেছিল। তার ফল হয়েছে এইটা—" ঈশিতা এবার হাজেরার মৃত্যুসংবাদ ছাপা হওয়া খবরের কাগজের কাটিংটা দিল।

মানুষটা খবরের কাগজটা পড়ে মুখ তুলে বলল, "আত্মহত্যা করেছে?"

"না। মহিলাটাকে মেরে ফেলেছে।"

"আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমি জানি। সন্তানকে নিয়ে ব্যাকুল কোনো মা আত্মহত্যা করে না। তা ছাড়া আমি সেখানে দুজন মানুষকে দেখেছি, যারা অবলীলায় মানুষ খুন করতে পারে বলে নিজে আমাকে জানিয়েছে।"

মানুষটাকে এবার কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। মাথা নেড়ে বলল, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"পারার কথা নয়। আমি অনেক দিন থেকে লেগে আছি, তাই এখন একটু একটু বুঝতে শুরু করেছি।" ঈশিতা মুখ শক্ত করে বলল, "মকবুল নামের ছেলেটা এনডেভারের ভেতরেই আছে বলে আমার ধারণা। সেখানে কেউ ঢুকতে পারে না, আপনারা ছাড়া।"

"আমরা শুধু অক্সিজেন সাপ্লাইটা দেখি। আমাদের কোম্পানির দায়িত্ব অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক রাখা, আর কিছু না।"

আমার বই.কম
amarboi.com

"সেটাই দরকার। অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের শেষে থাকে একজন মানুষ। আমি শুধু জানতে চাই, সেই মানুষগুলোর মধ্যে মকবুল নামের ছেলেটা আছে কি না। আর কিছু না।"

মানুষটা নিঃশব্দে মকবুলের ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা বলল, "ঠিক আছে, আপনি যদি আমাকে আপনাদের টিমের সঙ্গে নিতে না চান, তাহলে অন্তত আমাকে এটুকু সাহায্য করেন। আপনি ভেতর থেকে এটুকু খবর এনে দেন যে মকবুল ভেতরেই আছে। বেঁচে আছে।"

মানুষটা কোনো কথা না বলে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা তার পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে মানুষটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এই যে এটা আমার কার্ড। আমার ফোন নম্বর, ই-মেইল, ওয়েবসাইট সব দেওয়া আছে। যদি আপনি কিছু জানতে পারেন আর যদি আমাকে জানাতে চান, তাহলে জানাতে পারেন।"

ঈশিতা উঠে দাঁড়িয়ে যখন চলে যেতে শুরু করেছে, তখন মানুষটি বলল, "আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।"

"কোন ব্যাপার?"

"আপনার কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে এটা অসম্ভব বিপজ্জনক একটা ব্যাপার। খবর চেপে রাখার জন্য মানুষ মানুষকে মেরে ফেলে। অথচ আপনি আমার কাছে এসে সবকিছু বলে দিলেন। কোনো রাখঢাক নেই। আপনি আমাকে বিশ্বাস করে বসে আছেন?"

ঈশিতা মাথা নাড়ল, বলল, "জি, করেছি।"

"কেন? এত বড় একটা ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিশ্বাস করলেন কেন?"

"আমি সাংবাদিক মানুষ। আমার কাজই হচ্ছে খোঁজখবর নেওয়া। আমি খোঁজখবর নিয়ে এসেছিলাম। আপনার বাবা ষাটের দশকে বামপন্থী রাজনীতি করতেন। মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। আপনি মাজু বাঙালি ছদ্মনামে কবিতা লেখেন। কবিতাগুলো এখনো একটু কাঁচা কিন্তু বিষয়বস্তু খাঁটি। দেশের জন্য ভালোবাসা, দেশের মানুষের জন্য ভালোবাসা। আমি জানি, আপনি আর যা-ই করেন, কখনো দেশের মানুষের সঙ্গে বেইমানি করবেন না।"

মানুষটা ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর আমি কেমন করে বুঝতে পারব, আপনি আসলে কারও সঙ্গে বেইমানি করছেন না?"

"আমার চোখের দিকে তাকাবেন, তাহলেই বুঝবেন। মানুষকে কোথাও না কোথাও অন্য মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়।"

ঈশিতা চলে যেতে যেতে আবার থামল। বলল, "মকবুলের ছবিটা আপনার কাছেই থাকুক। কিন্তু এ ছবিটা আপনার কাছে আছে, সেটা জানাজানি হলে আপনার বিপদ হতে পারে।"

মাজু বাঙালি ছদ্মনামে কবিতা লেখে যে মানুষটি, সে কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে মকবুলের ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল।

দুদিন পর ঈশিতা একটা টেলিফোন পেল, ভারী গলায় একজন জানতে চাইল, "ঈশিতা?"

"কথা বলছি।"

"আমি মাজহার।" গলার স্বরটা পরিচিত, কিন্তু ঈশিতা ঠিক চিনতে পারল না। তখন মানুষটি তার পরিচয় আরেকটু বিস্তৃত করল। বলল, "আপনি আমাকে মাজু বাঙালি হিসেবে জানেন। কবি মাজু বাঙালি। কবি অংশটা দুর্বল, বাঙালি অংশটা শক্ত।"

ঈশিতা উত্তেজিত গলায় বলল, "আপনি! কি আশ্চর্য! কোনো খবর আছে?"

"আছে। ছেলেটা বেঁচে আছে।"

"বেঁচে আছে?"

"হ্যাঁ। তবে এই বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। যন্ত্রপাতি দিয়ে বেঁচে থাকা।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। আমি নিজের চোখে দেখেছি।"

ঈশিতা বলল, "ব্যাস। এর বেশি টেলিফোনে বলার দরকার নেই। আমার টেলিফোন ট্যাপ করছে বলে মনে হয়। আমি আপনার সঙ্গে দেখা করে শুনে নেব।"

"ঠিক আছে।"

ঈশিতা টেলিফোন লাইন কেটে দিল।

৬.

রাফি তার ক্লাস লেকচার ঠিক করছে, তখন সে শুনল চিকন গলায় একজন বলল, "আসতে পারি, স্যার?"

রাফি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, শারমিন অনেকগুলো বই বুকে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। রাফি বলল, "এসো শারমিন।"

শারমিন ভেতরে এসে বইগুলো টেবিলে রেখে বলল, "আপনার বইগুলো।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"সব পড়া শেষ?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "জি।"

শারমিন পড়া শেখার পর রাফি তাকে বই সাপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করছে। মেয়েটির পড়ার জন্য সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। রাফি তাল সামলাতে পারছে না। লাইব্রেরিতে অনেক বই, কিন্তু মেয়েটির বয়স কম, তাই সব বই দিতে পারছে না। রাফি বইগুলো ড্রয়ারে রাখতে রাখতে বলল, "ভেরি গুড শারমিন। আমি এর আগে কাউকে এত তাড়াতাড়ি বই পড়তে দেখিনি।"

শারমিন হাসি হাসি মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। রাফি বলল, "তুমি সত্যি সত্যি পড়ছ, নাকি আমাকে বোকা বানাচ্ছ?"

"সত্যি সত্যি পড়ছি।"

"ভেরি গুড।"

"আমাকে তো কেউ পড়তে শেখায়নি, তাই নিজের মতো করে পড়ি। সেজন্য মনে হয়, তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

"নিজের মতো করে? সেটা কী রকম?"

"একটা একটা শব্দ না পড়ে একসঙ্গে পুরো পৃষ্ঠা।"

"একসঙ্গে পুরো পৃষ্ঠা?"

শারমিন মাথা নাড়ল। রাফি অবাক হয়ে বলল, "কী বলছ তুমি? সেটা কীভাবে সম্ভব?"

শারমিন লাজুক মুখে বলল, "আমি পারি।"

"দেখি।" রাফি একটা বই শারমিনের হাতে তুলে দিয়ে বলল, "পড়ো দেখি।"

শারমিন বইটা হাতে নিয়ে একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকে। রাফি বলল, "পড়ো।"

"পড়ছি তো।"

"পড়ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি যে কয় পৃষ্ঠা উল্টেছ, সেই কয় পৃষ্ঠা পড়ে ফেলেছ?"

"হ্যাঁ।"

রাফি বইটা হাতে নিয়ে বলল, "বলো দেখি, কী লেখা আছে প্রথম পৃষ্ঠায়।"

শারমিন পুরো পৃষ্ঠাটা অবিকল বলে গেল, দাঁড়ি-কমাসহ। রাফি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "আমি তোমাকে নিয়ে কী করব জানি না শারমিন!"

আমার বই . কম
amarboi.com

"আমাকে নিয়ে কিছু করতে হবে না। খালি আমাকে প্রতিদিন পড়ার জন্য কয়েকটা করে বই দিবেন।"

"দিব, নিশ্চয়ই দিব।"

শারমিন কথা বলতে বলতে চোখের কোণা দিয়ে রাফির টেবিলে রাখা কম্পিউটার মনিটরটা দেখছিল, শেষ পর্যন্ত সাহস করে জিজ্ঞেস করে ফেলল, "স্যার, আপনার টেবিলের এইটা কি কম্পিউটার?"

"হ্যাঁ। এইটা কম্পিউটার।" রাফি মনিটরটা দেখিয়ে বলল, "এইটা হচ্ছে মনিটর। এখানে দেখা যায়। আসল কম্পিউটারটা নিচে। আর এইটা হচ্ছে কী-বোর্ড আর মাউস।"

শারমিন চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ সবকিছু দেখল। তারপর ইতস্তত করে বলল, "কম্পিউটার দিয়ে কীভাবে কাজ করে, আমাকে একদিন দেখাবেন?"

"অবশ্যই দেখাব। কিন্তু তুমি নিজেই তো একটা কম্পিউটার, তুমি এই কম্পিউটার দেখে কী করবে?"

শারমিন কোনো কথা না বলে একটু হাসার ভঙ্গি করল। রাফি বলল, "আমি তোমাকে ইচ্ছে করলে এখনই দেখাতে পারি—বাচ্চাকাচ্চাদের যেভাবে দেখাই। তোমাকে বলতে পারি, এটা দিয়ে টাইপ করে, এটা দিয়ে ছবি আঁকে, এটা দিয়ে গেম খেলে—এ রকম। কিন্তু তুমি হচ্ছ একটা প্রডিজি। তুমি হচ্ছ সুপার ডুপার জিনিয়াস। তোমাকে তো এভাবে দেখালে হবে না, ঠিক করে দেখাতে হবে। তার জন্য তোমার একটু ইংরেজি শিখতে হবে। জানো ইংরেজি?"

"একটু একটু। বাংলা কম্পিউটার নাই?"

"একেবারে নাই বলা যাবে না, কিন্তু তোমার জন্য দরকার আসল খাঁটি কম্পিউটার। বই দিয়ে তুমি যে খেলা দেখিয়েছ, এখন কম্পিউটার দিয়ে না জানি কী দেখাবে!"

"আমাকে কখন দেখাবেন?"

"আমার তো এখন একটা ক্লাস আছে। ক্লাসটা নিয়ে এসে তোমাকে দেখাই?"

শারমিনের মুখে আনন্দের একটা ছাপ পড়ল। বলল, "আমি ততক্ষণ এখানে বসে থাকি?"

"বসে থেকে কী করবে?"

"কিছু করব না। আমি কিছু ছোঁব না। শুধু তাকিয়ে থাকব।"

রাফি হেসে ফেলল। বলল, "শুধু তাকিয়ে থাকতে হবে না। তুমি একটু ছুঁতেও পারো। এই যে এটা হচ্ছে মাউস, এটা নাড়াচাড়া করে একটু টেপাটেপি করতে পারো।"

"কিছু নষ্ট হয়ে যাবে না তো?"

"সেটা নির্ভর করে তুমি কী টেপাটেপি করছ তার ওপর। হ্যাঁ, তুমি চাইলে আমার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারো।"

"তাহলে আমি কিছু ধরব না।"

রাফি বলল, "ভয় নেই। ধরো। টেপাটেপি করো। আমি দেখি, এক ঘণ্টায় তুমি এই কম্পিউটার থেকে কী বের করতে পারো।"

শারমিনের মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনি রাগ হবেন না তো?"

"না, রাগ হব না। আমার সবকিছু ব্যাকআপ থাকে, আমি মাঝেমধ্যে মানুষকেও বিশ্বাস করি, কিন্তু কম্পিউটারকে বিশ্বাস করি না।"

এক ঘণ্টা পর রাফি এসে দেখে, শারমিন আরএসএ সাইটে ঢুকে একশ ডিজিটের একটা কম্পোজিট সংখ্যাকে দুটি উৎপাদকে ভাগ করে বসে আছে। রাফিকে দেখে লাজুক মুখে হেসে বলল, "এখানে ইংরেজিতে কী লিখেছে, বুঝতে পারছি না।"

রাফি পড়ে বলল, "এই সাইট থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছে, তুমি যে কম্পোজিট সংখ্যাকে ফ্যাক্টরাইজ করেছ সেটা যদি দশ বছর আগে করতে তাহলে তুমি এক হাজার ডলার পুরস্কার পেতে!"

শারমিন অবাক হয়ে বলল, "এ-ক-হা-জা-র ডলার?"

রাফির অবাক হওয়ার ক্ষমতাও নেই, সে নিঃশ্বাস আটকে বলল, "এক হাজার না দশ হাজার ডলার সেটা নিয়ে আমার এতটুকু কৌতূহল নেই। আমি জানতে চাই তুমি এক ঘণ্টার মধ্যে কেমন করে ব্রাউজিং করে একেবারে তোমার উপযুক্ত একটা সাইটে ঢুকেছ—"

"ঢুকতে পারিনি।"

"পেরেছ। ঢুকে ফ্যাক্টরাইজ করেছ।"

"আমি অন্য একটা জায়গায় ঢুকতে চেয়েছিলাম। ঢুকতে দেয়নি, বলে পাসওয়ার্ড লাগবে। আমি যদি আন্দাজ করে পাসওয়ার্ড দিই তাহলে ঢুকতে দেবে?"

আমারবই.কম
amarboi.com

"আন্দাজ করে পাসওয়ার্ড দেওয়া যায় না। পাসওয়ার্ড জানতে হয়।"

"কিন্তু—" শারমিনকে একটু বিভ্রান্ত দেখায়, "আমি কয়েক জায়গায় আন্দাজে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে গেছি!"

রাফি চোখ কপালে তুলে বলল, "কী বললে? কী বললে তুমি? আন্দাজে পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে গেছ?"

শারমিন ভয়ে ভয়ে বলল, "কেন স্যার? এটা করা কি ভুল?"

"টেকনিক্যালি ইয়েস। অন্যের পাসওয়ার্ড দিয়ে ঢুকে যাওয়া বেআইনি কাজ। রিয়েলিস্টিক্যালি এটা অসম্ভব। তুমি কেমন করে করলে?"

শারমিন শুকনো মুখে বলল, "এখন কি কোনো বিপদ হবে?"

"সেটা নির্ভর করছে তুমি কোন কোন সাইটে ঢুকে কী কী করেছ তার ওপর।"

"আমি কিছু করিনি। শুধু ঢুকেছি আর বের হয়েছি। হবে কোনো বিপদ?"

রাফি হেসে বলল, "না, কোনো বিপদ হবে না। আর যদি হয় সেটা তোমার হবে না। সেটা হবে আমার!"

"আমি স্যার বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছি—"

"শারমিন, তোমার ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের এখন একটু সাবধান হওয়ার ব্যাপার আছে। তুমি আসলে এখনো টের পাওনি তুমি কী। যদি বাইরের মানুষ খবর পায় তাহলে তোমাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যাবে। কাজেই এখন আমরা খুব সতর্ক হয়ে যাব। তুমি কাউকে কিছু বলবে না।"

শারমিন ভয়ে ভয়ে বলল, "বলব না।"

"প্রথমে আমার একটু আন্দাজ করতে হবে তোমার আসল ক্ষমতা কতটুকু। পারব কি না জানি না, কিন্তু চেষ্টা করব।"

শারমিন কোনো কথা না বলে ভীত চোখে রাফির দিকে তাকিয়ে রইল। রাফি বলল, "রামানুজন নামে একজন খুব বড় ম্যাথমেটিশিয়ান ছিলেন, তার কোনো ফর্মাল এডুকেশান ছিল না। হার্ডি নামে আরেকজন বড় ম্যাথমেটিশিয়ানের সঙ্গে যখন রামানুজনের দেখা হলো, তখন হার্ডি খুব বিপদে পড়েছিলেন।"

"কী বিপদ?"

"তাকে কতটুকু কী শেখাবেন সেটা নিয়ে বিপদ। কোনো কিছু জোর করে শেখাতে গিয়ে যদি রামানুজনের স্বাভাবিক প্রতিভার কোনো ক্ষতি হয়ে যায়, সেই বিপদ। তোমাকে নিয়ে আমারও সেই একই অবস্থা—তোমাকে কতটুকু শেখাব? কী শেখাব?"

শারমিন নিচু গলায় বলল, "আমাকে কিছু শেখাতে হবে না, শুধু আমার জন্য প্রত্যেক দিন কয়েকটা বই দেবেন।"

"হ্যাঁ। বই তো দেবই। কিন্তু তোমার ক্ষমতাটা একটু তো ব্যবহারও করতে হবে।" রাফি চিন্তিতভাবে তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, "তবে আজকে তুমি কম্পিউটারে যে খেলা দেখিয়েছ, তাতে মনে হচ্ছে তোমার ক্ষমতাটা পুরোপুরি বোঝা আমার সাধ্যে নেই।"

শারমিন ভয়ে ভয়ে রাফির দিকে তাকিয়ে রইল। রাফি গম্ভীর মুখে বলল, "তবে তুমি আমাকে কথা দিচ্ছ তো, তোমার যে এ রকম ক্ষমতা আছে সেটা তুমি কাউকে বলবে না।"

"বলব না।"

"তোমার আব্বুকেও বলবে না।"

"বলব না।"

আমার বই. কম
amarboi.com

"আম্মুকে না, ভাইবোন কাউকে না।"

"আম্মুকে না। ভাইবোনকে না।"

"স্কুলের টিচার, বন্ধুবান্ধব কাউকে বলবে না।"

"বলব না, কাউকে বলব না।"

"গুড।"

শারমিন দাঁড়িয়ে বলল, "আমি তাহলে এখন যাই?"

"যাও। শারমিন, আবার দেখা হবে।"

শারমিন শুকনো মুখে বের হয়ে গেল। সে বুঝতে পারছে তার অস্বাভাবিক একটা ক্ষমতা আছে, কিন্তু সেই ক্ষমতাটা তার জন্য ভালো হলো, না খারাপ হলো সেটা এখন আর সে বুঝতে পারছে না।

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে রাফির একটা টেলিফোন এল। অপরিচিত নম্বর। এত রাতে কে ফোন করেছে ভাবতে ভাবতে রাফি টেলিফোন ধরল, "হ্যালো।"

"রাফি? আমি ঈশিতা। এত রাতে ফোন করলাম কিছু মনে কোরো না।"

"মনে করার কী আছে? যতক্ষণ জেগে আছি, ফোন ধরা সমস্যা নয়। ঘুমিয়ে পড়লে অন্য কথা। কী ব্যাপার? তোমার নিজের ফোন কী হলো? কোথা থেকে ফোন করছ?"

আমার বই . কম

"আমার ফোন ট্যাপ করছে, তাই ওটা ব্যবহার করা ছেড়ে দিয়েছি। ওই ফোন থেকে যাকে ফোন করি, তার বারোটা বেজে যায়।"

"কী বলছ বুঝতে পারছি না।"

"প্রত্যেক দিন একটা করে নতুন সিম জোগাড় করি, কয়েকবার ব্যবহার করে ফেলে দিই! এখন বুঝতে পারছি জঙ্গিদের এতগুলো করে সিম থাকে কেন!"

রাফি ভুরু কুচকে বলল, "তুমি তো আমাকে চিন্তার মধ্যে ফেলে দিলে!"

"চিন্তারই ব্যাপার। যাই হোক, কদিন থেকে খুব চাপের মধ্যে আছি—কারও সঙ্গে কথা বলে একটু হালকা হওয়ার ইচ্ছে করছিল। সেই জন্য তোমাকে ফোন করেছি। একটু কথা বলি তোমার সঙ্গে?"

"বলো।"

"শারমিন কেমন আছে?"

"ভালো। আমরা শুধু তার ম্যাথ ক্যাপাবিলিটি দেখেছি। কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে দিলে সে অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটিয়ে ফেলে। না বুঝে সে ওয়েবসাইট হ্যাক করে ফেলতে পারে।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। কীভাবে করে সেটা একটা মিস্ট্রি। যাই হোক, তোমার কথা শুনি। তুমি কী নিয়ে এত চাপের মধ্যে আছ?"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমাদের মতো কয়েকজনকে বিষয়টা বলে রাখা ভালো। আমার যদি কিছু হয় তাহলে তোমরা যেন জানো তোমাদের কী করতে হবে।"

"তোমার কিছু একটা হবে কেন? কী হবে?"

"বলছি। তোমাকে এনডেভারের কথা বলেছিলাম, মনে আছে?"

"হ্যাঁ মনে আছে।"

"তোমাদের বায়োকেমিস্ট্রির টিচার সমীরের এফটি টুয়েন্টি সিক্স ভাইরাসের কথা মনে আছে?"

রাফি বলল, "মনে আছে।"

"টিঅ্যান্ডটি বস্তিতে সেই ভাইরাসের এপিডেমিক হলো মনে আছে?"

"হ্যাঁ, মনে আছে। এনডেভারে তাদের চিকিৎসা হচ্ছে।"

"আমার হাইপোথিসিস এ রকম। এনডেভার যে নিউরাল কম্পিউটারের কথা বলে, সেটা আসলে ভাঁওতাবাজি। তারা নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করে সত্যিকারের মানুষ দিয়ে। মানুষের ব্রেনে তারা কিছু একটা করে তাকে কম্পিউটার হিসেবে ব্যবহার করে।"

রাফি বলল, "ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কিন্তু বলতে থাকো।"

"কাজেই এনডেভারের হাইফাই মাইক্রোপ্রসেসর মেমোরির দরকার নেই। তাদের দরকার মানুষ। মানুষের ব্রেন। তাই তারা এসেছে বাংলাদেশে। তাদের ধারণা, এই দেশের গরিব মানুষের ব্রেন তারা ব্যবহার করতে পারবে। তারা শুরুও করেছে।"

রাফি বলল, "তোমার ধারণা এফটি টুয়েন্টি সিক্স ভাইরাসটা এনডেভার ছড়িয়েছে?"

"এক্স্যাক্টলি। যারা এফেক্টেড হয়েছে তাদের চিকিৎসার নাম করে নিজেদের বিল্ডিংয়ে নিয়ে গেছে। কাউকে কাউকে ভালো বলে ছেড়ে দিচ্ছে। কাউকে কাউকে রেখে দিচ্ছে।"

"রেখে দিচ্ছে মানে? বস্তির মানুষ গরিব থাকতে পারে, তাই বলে নিজের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়স্বজনকে রেখে দেবে? মারাও যদি যায় তাহলেও তো ডেডবডি এনে জানাজা পড়াবে।"

আমার বই. কম
amarboi.com

ঈশিতা বলল, "সেটা সত্যি। আর এ রকম একটা ব্যাপার দিয়েই আমি নিশ্চিত হয়েছি।"

"কীভাবে।"

"একজন মহিলার বাচ্চার কোনো খোঁজ নেই। মহিলা বলছে এনডেভারের অ্যাম্বুলেন্স তাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু রোগীর লিস্টে তার নাম নেই। মহিলা যখন চেঁচামেচি শুরু করেছে, তখন তাকে মেরে ফেলল।"

"কী বললে?" রাফি আর্তনাদ করে বলল, "মেরে ফেলল?"

"হ্যাঁ। পত্রিকায় খবর এসেছে সুইসাইড, কিন্তু আমি জানি এটা মার্ডার। আমার কাছে বাচ্চার একটা ছবি আছে। মহিলা মারা যাওয়ার আগে তার কাছ থেকে নিয়েছি। আমি খোঁজ নিয়ে কনফার্মড হয়েছি, বাচ্চাটা ভেতরে আছে। ডিপ কোমায়—কিন্তু বেঁচে আছে।"

"তুমি কেমন করে কনফার্মড হলে?"

"সেটা অনেক লম্বা স্টোরি। তোমার সঙ্গে সামনাসামনি দেখা হলে সেটা বলব! খুবই ইন্টারেস্টিং স্টোরি।"

রাফি বলল, "ঈশিতা। আমি তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

আমার বই . কম
amarboi.com

ঈশিতা হাসল, বলল "তুমি আর আমাকে কখন দেখেছ? বলো, যতই শুনছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি।"

"ঠিক আছে, যতই শুনছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাই হোক ঈশিতা, ডু ইউ নো—"

"নো হোয়াট?"

"এখন আমার মনে হচ্ছে তোমার হাইপোথিসিস সত্যি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তার কারণ—"

"কারণ?"

"টিঅ্যান্ডটি বস্তিতে বাচ্চাদের ভাইরাস ইনফেকশনের পর যখন তাদের এনডেভারে নিয়ে গেছে, তার পরপরই একটা প্রেস রিলিজ দিয়েছে। সেই প্রেস রিলিজে—"

ঈশিতা রাফিকে কথা শেষ না করতে দিয়ে বলল, "আমিও তোমাকে সেই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম। তারা এনাউন্স করেছে নিউরাল কম্পিউটারে তারা একটা মাইলফলক অতিক্রম করেছে। কীভাবে করেছে বুঝতে পারছ তো?"

"মানুষের ব্রেনের ভেতরে কিছু একটা করে?"

"হ্যাঁ। যাদের ধরে নিয়েছে তাদের প্রথমবার ব্যবহার করেছে। সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট!"

রাফি লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এখন তোমার কী প্ল্যান?"

"এনডেভারকে ধরিয়ে দেওয়া।"

"কীভাবে ধরাবে?"

"জানি না। কেউ আমার একটা কথাও বিশ্বাস করবে না। তার কারণ সবই আমার স্পেকুলেশন, না হয় শোনা কথা। আমার কাছে কোনো প্রমাণ নেই। সারা দেশে এনডেভারের গুড উইল খুব উঁচুতে। কেউ যদি এনডেভারের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ তাকে ক্রিমিনাল হিসেবে ধরে নেবে। সবচেয়ে বড় কথা—"

"কী সবচেয়ে বড় কথা?"

"এনডেভার টাকা দিয়ে অনেক বড় বড় লোককে কিনে নিয়েছে। ইন্টেলিজেন্সের লোকজন তাদের পক্ষে কাজ করছে। আমি কাউকে সন্দেহের কথাটা বলতেও পারব না। বলামাত্রই আমাকে খুন করে ফেলবে।"

রাফি তার গাল ঘষতে ঘষতে বলল, "তাহলে?"

আমার বই.কম
amarboi.com

"আমার প্রমাণ দরকার। প্রমাণ। প্রমাণের জন্য আমার এনডেভারের ভেতরে ঢোকা দরকার। নিজের চোখে সবকিছু দেখা দরকার। ফটো তোলা দরকার, ভিডিও করা দরকার।"

"তুমি কেমন করে এনডেভারের ভেতরে ঢুকবে?"

"জানি না। এর থেকে বাঘের খাঁচায় ঢোকা বেশি সহজ আর বেশি নিরাপদ।"

"সেটা ঠিকই বলেছ।"

"যাই হোক রাফি, আমি টেলিফোনটা রাখি। তোমার সঙ্গে কথা বলে বুকটা একটু হালকা হলো। তুমি চিন্তা করে আমাকে একটু আইডিয়া দাও। ওপরের দিকে তোমার যদি লাইনঘাট থাকে আমাকে জানিও।"

রাফি বলল, "সরি ঈশিতা। ওপরের দিকে আমার কোনো লাইনঘাট নেই।"

"তাহলে চিন্তা করে একটা আইডিয়া দাও।"

"ঠিক আছে।"

"বাই রাফি।"

"বাই ঈশিতা। ভালো থেকো।"

টুক করে লাইনটা কেটে গেল।

রাফি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। সে টের পাচ্ছিল তার শরীরের ভেতর এক ধরনের ক্রোধ পাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। এনডেভারের মতো একটা প্রতিষ্ঠান এই দেশে এসেছে মানুষের মস্তিষ্কের জন্য, তারা কেটেকুটে ইলেকট্রনিক ইমপ্লান্ট বসিয়ে এক ধরনের নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করবে। কিন্তু সেই কথাটা তারা কাউকে জানাতেও পারবে না, এটি কী রকম কথা?

রাফি ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তার এই ছোট বাসাটার সামনে এক চিলতে বারান্দা আছে, সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখা যায়। রাফি দেখল, আকাশে মেঘ এবং সেই মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ খেলা করছে। দূরে কোথাও বৃষ্টি হয়েছে এবং সেখান থেকে এক ঝলক ঠান্ডা বাতাস এসে তার শরীরকে শীতল করে দিল। ঠিক তখন তার শারমিনের কথা মনে পড়ল! শারমিনকে ঠিক করে ব্যবহার করতে পারলে সে নিশ্চয়ই এনডেভারের ডেটাবেসে ঢুকে সব তথ্য বের করে আনতে পারবে! ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে অসম্ভব, কিন্তু শারমিনের পক্ষে এটি সম্ভব হতে পারে। সারা পৃথিবীতে মনে হয় শুধু এই বাচ্চা মেয়েটিই এই অসম্ভব কাজটি করতে পারবে। রাফির মনে হলো যে এক্ষুনি ফোন করে সে ঈশিতাকে কথাটা বলে, কিন্তু ঘড়ি দেখে সে শেষ পর্যন্ত ফোন করল না। তা ছাড়া ঈশিতা তার টেলিফোন নিয়ে যে রকম ভয়ভীতি দেখিয়েছে এভাবে হুট করে ফোন করা হয়তো ঠিকও হবে না। কাল পরশু উইকএন্ড, ইউনিভার্সিটি বন্ধ, কাজেই শারমিনকে নিয়ে সে এনডেভারের সাইটটাকে হ্যাক করার চেষ্টা করবে! যদি সত্যি সত্যি করতে পারে তাহলে ঈশিতার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ভোরবেলা তারা শারমিনের বাসাটি খুঁজে বের করতে হবে—কাজটি খুব কঠিন হওয়ার কথা নয়।

আমার বই.কম
amarboi.com

রাফির মস্তিষ্ক নিশ্চয়ই উত্তেজিত হয়েছিল। কারণ, সারা রাত সে এনডেভারের ওয়েবসাইট স্বপ্নে দেখল। তার ভেতরে গোলকধাঁধার মতো একটা জায়গায় শারমিন আর সে আটকা পড়ে গেছে; বের হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু বের হতে পারছে না। সে শুনতে পাচ্ছে, ঈশিতা চিৎকার করছে, কিন্তু সে তার কাছে যেতে পারছে না। বারবার চেষ্টা করছে, কিন্তু অদৃশ্য একটা দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দ্রুত নাশতা করে রাফি বের হয়ে পড়ে। ক্যাম্পাসের দারোয়ানদের জিজ্ঞেস করতেই তারা শারমিনের বাসার ঠিকানা বলে দিল। রাফি রিকশা করে সেখানে হাজির হলো। ছোট টিনের ছাপড়া ঘর। কাছাকাছি অনেক বাসা, বাইরে ছোট ছোট বাচ্চারা ধুলায় গড়াগড়ি দিয়ে খেলছে। শারমিনের কথা জিজ্ঞেস করতেই একজন রাফিকে তাদের বাসায় নিয়ে গেল।

শারমিন তার মায়ের সঙ্গে কলতলায় বসে থালা-বাসন ধুচ্ছিল। রাফিকে দেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আনন্দে তার মুখে হাসি ফুটে ওঠে, "স্যার! আপনি এসেছেন।"

রাফি বলল, "হ্যাঁ, আমি এসেছি।" শারমিন তার মায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, "মা, যে স্যার আমাকে লাল রঙের চশমা দিয়ে পড়ালেখা করতে শিখিয়েছেন, ইনিই হচ্ছেন সেই স্যার।"

মা শাড়ির আঁচল মাথায় তুলে হাসিমুখে বললেন, "আপনার লেখাপড়া শেখা মেয়ে এখন দিনরাত খালি পড়ে আর পড়ে। সংসারের কোনো কাজ করতে চায় না।"

রাফি ঠিক বুঝতে পারল না এই মহিলার কি তার মেয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে কোনো ধারণা আছে কি না। সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, "ভালো তো! যত পড়বে তত শিখবে!"

আমারবই.কম
amarboi.com

মা বললেন, "আমরা গরিব ঘরের মানুষ। আমাদের এত লেখাপড়ার দরকার কী!"

রাফি বলল, "কী বলেন আপনি? শারমিন কত ব্রাইট একটা মেয়ে, আপনি জানেন, দেখবেন, সে কত বড় হবে!"

রাফির গলার স্বর শুনে ভেতর থেকে শারমিনের বাবা বের হয়ে এল, খুব ব্যস্ত হয়ে ভেতর থেকে একটা কাঠের চেয়ার টেনে এনে তাকে বসতে দিল। রাফি চেয়ারে বসে বলল, "আমি একটা কাজে এসেছি।"

"বলেন, কী কাজ।"

"কম্পিউটারে আমার কিছু কাজ ছিল, আমি সেখানে শারমিনের একটু হেল্প নিতে চাই।"

বাবা হেসে ফেলল। বলল, "শারমিন আপনাকে সাহায্য করতে পারবে? ও তো জীবনে কম্পিউটার দেখেই নাই।"

রাফি বলল, "সেটা নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তাকে যতটুকু শেখাতে হবে, আমি সেটা শেখাব।"

বাবা শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই মেয়ে তো আপনার কাছে যাওয়ার জন্যে একপায়ে খাড়া। আপনি প্রথম তার ক্ষমতাটা বের করেছেন—আপনি তার ব্রেনের সমস্যা দূর করে লেখাপড়া করতে শিখিয়েছেন, আপনি তাকে বইপত্র পড়তে দিচ্ছেন, সেদিন আপনি আপনার কম্পিউটার তাকে ব্যবহার করতে দিলেন—সবই তো আপনিই করেছেন। এই মেয়ে যতখানি আমার, ততখানি আপনার।"

"গুড। আপনার মেয়ের ব্রেনটাকে আমি আজকে আর কালকে একটু ব্যবহার করব!"

"কোনো সমস্যা নাই।"

রাফি বলল, "শুধু একটা ব্যাপার।"

"কী ব্যাপার?"

"আমি যে শারমিনকে দিয়ে এসব কাজ করাচ্ছি, আপনি সেগুলো কাউকে বলবেন না।"

শারমিনের বাবা বলল, "মাথা খারাপ! ভোটকা হান্নানের পর আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আমি কাউকে কিছু বলি না।"

"হ্যাঁ, বলার দরকার নেই।"

আমার বই . কম

রাফি তখন তখনই শারমিনকে নিয়ে বের হতে চাইছিল, কিন্তু তাকে চা খেতে হলো এবং একটু পায়েস খেতে হলো। পায়েস রাফির প্রিয় খাবার নয়, গরিব মানুষের ঘরের পায়েসও ভালো হয় না, কিন্তু রাফি অবাক হয়ে দেখল, পায়েসটা চমৎকার।

রিকশায় উঠে রাফি শারমিনকে বলল, "আমি তোমাকে এখন যে কথাগুলো বলব, তুমি সে কথাগুলো কাউকে বলবে না।"

শারমিন মুখ শক্ত করে বাধ্য মেয়ের মতো বলল, "বলব না।"

"তুমি ছোট একটি মেয়ে, কিন্তু এখন আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব বড় মানুষের মতো। বুঝেছ?"

শারমিন মাথা নাড়ল। রাফি বলল, "আমাদের দেশে এনডেভার নামে একটা কম্পিউটারের কোম্পানি এসেছে বিশেষ এক ধরনের কম্পিউটার বানানোর জন্য। মানুষের ব্রেন যেভাবে কাজ করে, এই কম্পিউটারগুলো সেভাবে কাজ করবে। কিন্তু এরা কম্পিউটার না বানিয়ে কী করছে, জানো?"

"কী?"

"সত্যি সত্যি মানুষকে ধরে নিয়ে তাদের ব্রেন দিয়ে কম্পিউটার বানাচ্ছে।"

শারমিন চমকে উঠে বলল, "সর্বনাশ!"

"হ্যাঁ, সর্বনাশ!" রাফি বলল, "ঢাকা থেকে একজন সাংবাদিক আপা এসেছিল, মনে আছে তোমার?"

"হ্যাঁ, ঈশিতা আপু।"

"সেই ঈশিতা আপু এই জিনিসটা জানতে পেরেছে, কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি, জানো?"

"কী?"

"সেটা কোনোভাবে প্রমাণ করা যাচ্ছে না। আর প্রমাণ করা না গেলে এনডেভারকে ধরা যাচ্ছে না। আর এনডেভারকে ধরা না গেলে তারা এ দেশে বসে গরিব মানুষের বাচ্চা-কাচ্চাকে ধরে ধরে তাদের ব্রেনকে ব্যবহার করবে। বুঝছো?"

শারমিন মাথা নেড়ে বলল, "বুঝেছি।"

"এখন আমি তোমাকে কেন নিয়ে এসেছি, বুঝেছো?"

শারমিন মাথা নাড়ল, বলল, "না, বুঝি নাই।"

"তুমি এনডেভারের ওয়েবসাইটে ঢুকবে। তখন আমরা সেখান থেকে এনডেভারের সব তথ্য বের করে আনব।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"আমি পারব?"

"হ্যাঁ, পারবে। আমি তোমাকে বলে দেব, কী করতে হবে। একটা ওয়েবসাইটে ঢুকতে হলে কিছু বেআইনি কাজ করতে হয়। আমরা সেই বেআইনি কাজ করব, কেউ জানবে না সেটা তুমি করেছ। যদি জানতেও পারে, সেটা হবে আমার কম্পিউটার। কাজেই দোষ হলে সেটা হবে আমার। তোমার কোনো ভয় নেই।"

শারমিন হেসে বলল, "আমার কথা জানলেও ক্ষতি নাই! আমি ভয় পাই না।"

"তার পরও তোমাকে এই ঝামেলা থেকে দূরে রাখব। মাঝে মাঝে কিছু জটিল সমস্যা থাকবে, তোমাকে তার সমাধান করে দিতে হবে।"

"কী রকম সমস্যা?"

"তুমি এর মধ্যে এগুলো করেছ। বড় একটা সংখ্যাকে দুটি উৎপাদকে বের করা। কিংবা একটা পাসওয়ার্ডকে গোপন করে রাখা আছে, সেটা বের করা। এ রকম কাজ—অন্য যেকোনো মানুষের জন্য সেটা অসম্ভব, কিন্তু আমার ধারণা, তুমি পারবে।"

ছুটির দিন বলে ইউনিভার্সিটিতে মানুষজন খুব বেশি নেই। রাফি শারমিনকে নিয়ে তাদের নেটওয়ার্কিং ল্যাবে ঢুকল। বিকেলের দিকে এই ল্যাবে কাজ করার জন্য কিছু ছাত্র আসে, এখন কেউ নেই। কেউ আসার আগে রাফি এনডেভারের ওয়েবসাইটটা হ্যাক করে ফেলতে চায়।

শারমিনকে বিষয়টা বোঝাতে খুব বেশি সময় লাগল না। কোথা থেকে হ্যাক করছে, যেন জানতে না পারে, সে জন্য আইপি অ্যাড্রেসটাকে একটু পরে পরে বানোয়াট আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে পাল্টে দিতে হচ্ছিল। সিকিউরিটি অসম্ভব কঠিন। একবার মনে হচ্ছিল বুঝি, ডেটাবেসে ঢোকাই যাবে না, কিন্তু শারমিন কীভাবে জানি ঢুকে গেল। সেখানে সিকিউরিটির নানা পর্যায়ের এনক্রিপটেড সংখ্যাগুলো পাওয়া গেল। শারমিন সেগুলো নিয়ে কাজ করতে থাকে। একটা সুপার কম্পিউটার কয়েক মাস চেষ্টা করে যেটা বের করতে পারত, শারমিন ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেটা করে ফেলল। শারমিন যদিও রাফিকে কিছু বলল না, কিন্তু রাফি বুঝতে পারল, তার অসম্ভব পরিশ্রম হয়েছে। সে যখন কম্পিউটার মনিটরে দীর্ঘ সংখ্যাগুলোর দিকে একদৃষ্টে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে, তখন তাকে দেখে মনে হয়, সে বুঝি অন্য জগতের মানুষ। তার চোখমুখ কঠিন হয়ে যায়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয় এবং কখনো কখনো দুই হাত দিয়ে তার মাথা চেপে ধরে রাখে। রাফির ভয় হয়, এই অমানুষিক একটা কাজ করতে গিয়ে তার মাথার ভেতরে রক্তের কোনো ধমনি না ছিঁড়ে যায়।

আমার বই : কম
amarboi.com

শেষ পর্যন্ত এনক্রিপশনটা ভেঙে শারমিন বলল, "স্যার, এই যে এটা করেছি। দেখেছেন, হয়েছে কি না?"

"দেখছি। তুমি একটু রেস্ট নাও।"

"আগে দেখেন, যদি হয়ে থাকে তাহলে রেস্ট নেব।"

রাফি কাঁপা হাতে দুই শ পঞ্চাশ ঘর লম্বা একটা সংখ্যা খুব সাবধানে প্রবেশ করাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য কম্পিউটার মনিটরটি স্থির হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ করে তার সামনে এটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। রাফি নিঃশ্বাস বন্ধ করে কি-বোর্ডে দু-একটি অক্ষর লিখে পরীক্ষা করে। শারমিন উৎকণ্ঠিত গলায় বলল, "হয়েছে?"

"হ্যাঁ, হয়েছে।" রাফি শারমিনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "চমৎকার শারমিন। ফ্যান্টাস্টিক।" রাফি দেখল, শারমিনের মাথাটা আগুনের মতো গরম হয়ে আছে, কী আশ্চর্য!

শারমিন দুর্বল গলায় বলল, "আমি একটু বিশ্রাম নিই?"

"নাও।"

রাফির কথা শেষ হওয়ার আগেই শারমিন টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। রাফি শারমিনকে ধরে ল্যাবের পেছনে রাখা সোফায় শুইয়ে দিল। তারপর নিঃশব্দে সে নিজে এনডেভারের ডেটাবেসে ঘুরে বেড়াল। অত্যন্ত জটিল একটি সিস্টেম। প্রতিটি মানুষের সব তথ্য রয়েছে। কোন মানুষের কতটুকু সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স, তা ঠিক করে দেওয়া আছে। পুরো বিল্ডিংটি অসংখ্য সিসি ক্যামেরা দিয়ে নজরে রাখা হয়েছে। ইচ্ছে করলে সে যেকোনো কিছু দেখতে পারে। রাফি ইচ্ছে করলে এখন যেটা ইচ্ছে সেটা পরিবর্তন করে দিতে পারে, কিন্তু সে কোনো কিছু স্পর্শ করল না। এনডেভারের কেউ যেন বুঝতে না পারে, সে ভেতরে ঢুকেছিল, সে জন্য তার কোনো চিহ্ন না রেখে সে আবার বের হয়ে এল।

শারমিন ঘণ্টা খানেক পর হঠাৎ করে জেগে উঠে এদিক-সেদিক তাকাতে থাকে। তাকে দেখে মনে হয়, সে বুঝতে পারছে না, সে কোথায়। রাফি বলল, "কী হলো, শারমিন, তোমার ঘুম ভাঙল?"

শারমিন লাজুক মুখে বলল, "হায় খোদা! আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছি?"

আমার বই . কম

"প্রায় এক ঘণ্টা।"

amarboi.com

"এক ঘণ্টা! স্যার, আপনি আমাকে জাগিয়ে দিলেন না কেন?"

রাফি বলল, "তোমার ঘুমটার দরকার ছিল। মানুষের ব্রেন কীভাবে কাজ করে, এখনো মানুষ জানে না। আর তোমার মতো ব্রেন সম্পর্কে তো আরও কিছু জানে না। তুমি যখন ওই অসাধ্য কাজটা করেছ, তখন তোমার ব্রেনে খুব চাপ পড়েছে। তাই ঘুমটার দরকার ছিল।"

শারমিন কিছু বলল না, মাথা নাড়ল। রাফি বলল, "আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে তোমার অসম্ভব খিদে পাওয়ার কথা।"

শারমিন আবার মাথা নাড়ল। রাফি বলল, "আমার আগেই বিষয়টা খেয়াল করা উচিত ছিল। তোমার জন্য কিছু খাবার আনা উচিত ছিল।"

শারমিন বলল, "না না। লাগবে না। আমি বাসায় গিয়ে খাব।"

"বাসায় গিয়ে নিশ্চয়ই খাবে। তার আগে চলো, আমি আর তুমি অন্য কিছু খাই। আজ তো ছুটির দিন, ক্যাম্পাসে ক্যানটিন বন্ধ। বাইরে গিয়ে খেতে হবে। বলো শারমিন, তুমি কী খেতে চাও। তুমি যত বড় কাজ করে দিয়েছ, তোমাকে ফাইভ স্টার হোটেলে নিয়ে খাওয়ানো উচিত!"

শারমিন বলল, "কাজ হয়েছে, স্যার?"

"তুমি এনডেভারে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছ, এখন কাজ হবে। কঠিন কাজটা শেষ। এখন বাকি শুধু ছোট ছোট কাজ। সেখানেও তোমাকে লাগবে। কালকে আবার বসব। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে।"

শারমিনকে নিয়ে একটা চায়নিজ রেস্টুরেন্টে খেতে খেতে রাফি ঈশিতাকে ফোন করল। ঈশিতা ফোন ধরল না। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে অন্য একটা নাম্বার থেকে তাকে ফোন করল। রাফি বলল, "ঈশিতা, তুমি কোথায়?"

"অফিসে।"

"তুমি এই মুহূর্তে এখানে চলে আসো।"

"এই মুহূর্তে তো পারব না। আসতে আসতে কাল ভোর হয়ে যাবে।" রাফি বলল, "ঠিক আছে। কাল ভোরের ভেতর আসো।"

"কেন, বলবে?"

"না। শুধু জেনে রাখো, তোমার সমস্যার সমাধান হয়েছে।"

"আমি আসছি।"

আমার বই . কম
amarboi.com

ঈশিতা খুট করে লাইন কেটে দিল।

৭.

নেটওয়ার্কিং ল্যাবের এক কোনায় রাফি ঈশিতা আর শারমিনকে নিয়ে বসেছে। এটি একটা রিসার্চ ল্যাব, যেকোনো মুহূর্তে কোনো একজন শিক্ষক বা ছাত্র চলে আসতে পারে। কেউ এলেই তারা সৌজন্য দেখানোর জন্য তাদের কাছে আসবে, কথা বলবে। ছুটির দিন ভোরবেলায় ঢাকার একজন সাংবাদিক এবং বাচ্চা একটা মেয়েকে নিয়ে রাফি কী করছে, সেটা জানার জন্য হালকা কৌতূহল দেখাবে। তখন তাদের কী বলা হবে, সেটা আগে থেকে ঠিক করে রাখা আছে। ডিসলেক্সিয়া আছে, এ রকম বাচ্চা-কাচ্চাদের লেখাপড়া নিয়ে ঈশিতা একটা রিপোর্টিং করবে এবং তার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখা হচ্ছে। তাদের বলা হবে, পদ্ধতিগুলো কাজ করে কি না, সেগুলো সরাসরি শারমিনকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হচ্ছে—বিষয়টা বিশ্বাসযোগ্য করানোর জন্য এ ধরনের বেশ কিছু ওয়েবসাইট খুলে রাখা হয়েছে এবং কিছু কাগজও প্রিন্ট করে রাখা আছে। এই ল্যাবে না বসে তারা দরজা বন্ধ করে রাফির অফিসে বসতে পারত, কিন্তু রাফি বড় ব্যান্ড উইথ নিশ্চিত করার জন্য এই ল্যাবে বসেছে।

ল্যাবের ভেতরে এখনো অন্য কোনো শিক্ষক বা ছাত্র আসেনি, তাই তারা মোটামুটি কোনো বাড়তি ঝামেলা ছাড়াই কাজ করতে পারছে। রাফি এইমাত্র ঈশিতাকে এনডেভারের পুরো সাইটটা দেখিয়েছে, যারা কাজকর্ম করে, তাদের নানা ধরনের তথ্যে চোখ বুলিয়ে তারা এখন হাসপাতালের বিভিন্ন ঘরে রোগীদের প্রোফাইল দেখছিল। দোতলাটি মূল হাসপাতাল, তিন তলার কিছু ঘরে বিশেষ কয়েকজন রোগী। তাদের সারা শরীর নানা ধরনের যন্ত্রপাতি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। মুখে মাস্ক, অক্সিজেন টিউব, মাথার চুল

আমার বই. কম
amarboi.com

কামানো, সেখানে নানা ধরনের টিউব ও মনিটর। চারপাশে নানা আকারের স্ক্রিনে নানা ধরনের তরঙ্গ এবং সংখ্যা জ্বলজ্বল করছে। ঈশিতা নিঃশ্বাস আটকে বলল, "এদের ভেতর একজন নিশ্চয়ই মকবুল নামের হারিয়ে যাওয়া ছেলেটি।"

"তোমার ছবির সঙ্গে চেহারা মিলছে?"

ঈশিতা হাতের ছবিটার সঙ্গে চেহারা মেলানোর চেষ্টা করে বলল, "বলা মুশকিল। ছবিতে বাচ্চাটা হাসিখুশি। মাথা ভরা চুল। এখানে মাথা কামানো। খুলির ভেতর থেকে যন্ত্রপাতি টিউব বের হয়ে আসছে। মুখের ভেতর পাইপ, নাকের ভেতর পাইপ, মুখের বেশির ভাগ মাস্ক দিয়ে ঢাকা। চোখ-মুখ ফুলে আছে—ভয়ংকর দৃশ্য। মেলানো অসম্ভব।"

"তাহলে কী করবে?"

"এর নাম-ঠিকানা বের করতে পারবে?"

রাফি বলল, "নাম-ঠিকানা নেই, শুধু নম্বর দিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করেই নাম-ঠিকানা রাখছে না।"

"এই রোগীগুলোর ভিডিও নামানো যাবে?"

"যাবে। কিন্তু একটা ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকতে হবে।"

"কী?"

amarboi.com

"যেই মুহূর্তে ভিডিওগুলো নামাব, তাদের সিস্টেম কিন্তু সতর্ক হয়ে যাবে। কাজেই নতুন করে প্রোটেকশন দিয়ে আমাদের বের করে দিতে পারে।"

"তাহলে তো মুশকিল।"

রাফি বলল, "যখন তুমি একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হবে কোনটা নামাতে হবে, তখন আমরা ডাউনলোড শুরু করব।"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হানড্রেড পারসেন্ট নিশ্চিত হতে পারছি না। যদি সশরীরে ভেতরে ঢুকতে পারতাম, তাহলে হতো।"

শারমিন এতক্ষণ চুপ করে বসে তাদের কথা শুনছিল। এবার ইতস্তত করে বলল, "ঈশিতা আপু তো ইচ্ছা করলে ভেতরে ঢুকতে পারে।"

রাফি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, "কেমন করে?"

"যারা যারা এই বিল্ডিংয়ে ঢুকতে পারে, তাদের সবার ফটো আছে, নাম-ঠিকানা আছে। আমরা সেখানে ঈশিতা আপুর ফটো, নাম-ঠিকানা ঢুকিয়ে দিই। তাহলেই তো আপু ওই কোম্পানির একজন হয়ে যাবে!"

ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "এটা সম্ভব?"

রাফি মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, সম্ভব।"

"সত্যি?"

"সত্যি। তবে এখানে অন্য ঝামেলা আছে।"

"কী ঝামেলা?"

"এটা তো হাই সিকিউরিটি অফিস, এখানে তো শুধু ছবি আর আইডি কার্ডের ওপর ভরসা করে নেই। এরা নিশ্চয়ই আরও অনেক কিছু চেক করে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট হতে পারে।"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি চেক করে বের করতে পারবে?"

"অবশ্যই।" রাফি কম্পিউটার মনিটরে ঝুঁকে কি-বোর্ডে দ্রুত টাইপ করতে থাকে। একটু পরে হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, "নাহ্! হবে না।"

"কী হবে না?"

"তোমাকে ওদের ডেটাবেসে ঢুকিয়ে দিলেও লাভ নেই। ওরা সিকিউরিটির জন্য প্রত্যেক এমপ্লয়ির ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর রেটিনা চেক করে।"

"রেটিনা?" ঈশিতা অবাক হয়ে বলল, "রেটিনা কীভাবে চেক করে?"

"ছোট অপটিক্যাল ডিভাইস সরাসরি চোখের ভেতর দেখে রেটিনার একটা স্ক্যান করে। প্রত্যেক মানুষের রেটিনার ছবি আলাদা ফিঙ্গারপ্রিন্টের মতন।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। তুমি যদি বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকতেও পারো, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যেতে পারবে না। রেটিনা স্ক্যান করে দরজা খোলাতে হয়।"

ঈশিতা হতাশার ভঙ্গি করে মাথা নেড়ে বলল, "তাহলে ধরা না পড়ে আমার ঢোকার উপায় নেই!"

রাফি মাথা নেড়ে বলল, "আই এম সরি ঈশিতা, নেই।"

শারমিন আবার ইতস্তত করে বলল, "স্যার, একটা কাজ করলে কেমন হয়?"

"কী কাজ?"

"প্রোগ্রামের যেখানে রেটিনাটা মিলিয়ে দেখে, সেখানে যদি আমরা বদলে দিই?"

"কী বদলে দেবে, শারমিন?"

"রেটিনার ছবি না মিললেও প্রোগ্রামটা বলবে, মিলেছে!"

রাফি কয়েক মুহূর্ত শারমিনের দিকে তাকিয়ে থেকে তার পিঠে থাবা দিয়ে বলল, "ফ্যান্টাস্টিক, শারমিন! অবশ্যই আমরা এটা করতে পারি। কোডিং লেভেলে মেনিপুলেশন, কিন্তু তুমি থাকতে আমাদের ভয় কিসের।"

ঈশিতা একবার রাফির দিকে আরেকবার শারমিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? তোমরা আমাকে সশরীরে এনডেভারের ভেতর ঢোকাতে পারছ?"

রাফি বলল, "মনে হয় পারছি।"

"গুড।"

"কিন্তু শেষবার ভেবে দেখো ঈশিতা, তুমি আসলেই ভেতরে ঢুকতে চাও কি না।"

"চাই।"

"যদি কোনো বিপদ হয়?"

"দেখো রাফি, আমার জীবন এখন মোটামুটি বরবাদ হয়ে গেছে। আমি কিছুই করতে পারছি না—আমার পেছনে ফেউ লেগে আছে। টেলিফোনে কথা বলতে পারি না, ঘর থেকে বের হতে পারি না। আমার ধারণা, আমাকে কোনো একদিন মেরেই ফেলবে। পত্রিকায় কয়েক দিন লেখালেখি হবে, তারপর সবাই সবকিছু ভুলে যাবে। আমি আর পারছি না—আমি এটার শেষ দেখতে চাই। আমাকে একবার ভেতরে ঢুকতে দাও, বাকি দায়-দায়িত্ব আমার।"

আমার বই.কম
amarboi.com

রাফি কিছুক্ষণ ঈশিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ঠিক আছে ঈশিতা, আমরা তোমাকে এনডেভারের অফিসে ঢুকিয়ে দেব।"

এরপর রাফি আর শারমিন কাজে লেগে যায়। দুপুরের ভেতরেই কাজ শেষ হয়ে যেত, কিন্তু বিকেল পর্যন্ত লেগে গেল। কারণ, দুপুরের পরই এই ল্যাবের শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরা আসতে শুরু করল এবং রাফিকে ঈশিতা আর শারমিনের পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে তাদের খোঁজখবর নিল। সবাইকে খুশি করার জন্য রাফিকে ডিসলেক্সিয়ার ওপর অনেক তথ্য নামাতে হলো, প্রিন্ট করতে হলো এবং আলোচনা করতে হলো। তার পরও শেষ পর্যন্ত রাফি আর শারমিন মিলে সিকিউরিটি সফটওয়্যারের কোডিং পাল্টে দিল। এনডেভারের সিকিউরিটি সিস্টেম সত্যি সত্যি সবার রেটিনা স্ক্যান করবে, সেটি মিলিয়েও দেখবে, কিন্তু সেটি না মিললেও কোনো আপত্তি না করে দরজা খুলে দেবে। তিনজন বসে বসে সিকিউরিটির পুরো ব্যাপারটি

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখল। ঈশিতাকে ডেটাবেসে ঢোকানোর পর তাকে একটি এমপ্লয়ি নম্বর দেওয়া হলো। রাফি সেই এমপ্লয়ি নম্বর ব্যবহার করে তার ছবি আর এনডেভারের লগো দিয়ে একটি আইডি কার্ড ডিজাইন করে দিল। একটা প্লাস্টিক আইডি কার্ডের ওপর সেটা ছাপিয়ে নিতে হবে। এই আইডি কার্ডগুলো শুধু সৌন্দর্যের জন্য, এনডেভার তার সিকিউরিটি ব্যবস্থার জন্য এর ওপর নির্ভর করে নেই।

সব কাজ শেষ করে রাফি বিকেলে ঈশিতাকে বাসে তুলে দিয়ে আসে। বাস ছেড়ে দেওয়ার আগে ঈশিতা ফিস ফিস করে বলল, "আমার জন্য দোয়া কোরো, রাফি।"

রাফি নরম গলায় বলল, "আমি সব সময়ই তোমার জন্য দোয়া করি।"

ঈশিতা এনডেভারে ঢোকার জন্য সকালের দিকের সময়টা বেছে নিল। এফটি টোয়েন্টি সিক্স ভাইরাসের রোগীদের দেখার জন্য তাদের আত্মীয়স্বজনদের সকালবেলা ঢুকতে দেওয়া হয়, তখন খানিকটা ভিড় থাকে। সে ভিড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল, মোটামুটি আধুনিক পোশাক পরে এসেছে, চুলগুলো একটু ফাঁপিয়ে এনেছে, ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল রঙের লিপস্টিক। তার ঘাড় থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে, সেখানে মোবাইল টেলিফোন আর ক্যামেরা। ঈশিতা ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে গিয়ে শেষ মুহূর্তে ডান দিকে সরে গেল—এনডেভারের নিয়মিত কর্মচারীরা এখানে গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকে। গতকাল রাফির নেটওয়ার্কিং ল্যাবে কম্পিউটারের সামনে বসে পুরো প্রক্রিয়াটি অনেকবার দেখে মুখস্থ করে রেখেছে।

ভারী লোহার দরজার সামনে একটা ছোট মডিউল, সেখানে নিউমেরিক কি-প্যাড, সবাই এমপ্লয়ি নম্বরটি প্রবেশ করায়। ঈশিতাকে গতকাল রাফি আর শারমিন মিলে একটি এমপ্লয়ি নম্বর দিয়েছে—এখন প্রথমবার সে এটি প্রবেশ করাবে। সবকিছু যদি ঠিকভাবে করা হয়ে থাকে, সত্যি সত্যি যদি সিকিউরিটির মূল ডেটাবেসে তার এমপ্লয়ি নম্বরটি ঢোকানো হয়ে থাকে, তাহলে সে যখন তার নম্বরটি প্রবেশ করাবে, তখন দরজাটি খুলে যাবে। যদি ব্যাপারটি ঠিকভাবে করা না হয়ে থাকে, তাহলে কী হবে, সে জানে না। সম্ভবত কর্কশ স্বরে অ্যালার্ম বেজে উঠবে এবং গেটের কাছে কাচের ঘরে বসে থাকা সিকিউরিটির মানুষটি তার স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রটি নিয়ে ছুটে আসবে। ঈশিতা কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করাল। তারপর সাবধানে ছয় সংখ্যার এমপ্লয়ি নম্বরটি

প্রবেশ করাল, কোনো অ্যালার্ম বেজে উঠল না এবং খুট করে দরজাটি খুলে গেল। ঈশিতা বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটি সাবধানে বের করে দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। এখানে একটা ছোট করিডরের মতো রয়েছে, যাদের সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স রয়েছে, তারা ডান দিকের দরজা দিয়ে ঢুকবে, অন্যরা বাঁ দিকে। ঈশিতা ডান দিকে এগিয়ে গেল, একজন বিদেশি মানুষ তার আগে দাঁড়িয়েছে। প্রথমে আঙুলের ছাপ, তারপর চোখের রেটিনা স্ক্যান করিয়ে মানুষটি দরজা খুলে ঢুকে যাওয়ার পর ঈশিতা এগিয়ে গেল। কাচের প্লেটে তার দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল রাখার পর একটা সবুজ আলো ঝলসে উঠল। এবার তার রেটিনা স্ক্যান করাতে হবে নির্দিষ্ট জায়গায় থুতনি রেখে, ঈশিতা ছোট একটি লেন্সের ভেতর দিয়ে তাকায়। মুহূর্তের জন্য সে একটা লাল আলোর ঝলকানি দেখতে পেল। ঈশিতা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, রাফি আর শারমিন মিলে সবকিছু ঠিকভাবে করে রাখলে এখন দরজাটা খুলে যাওয়ার কথা। দরজা খুলল না এবং হঠাৎ করে ঈশিতার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে ওঠে। যদি সত্যি সত্যি দরজা না খোলে, তার কী অবস্থা হবে, সে চিন্তাও করতে চায় না। খুব সাবধানে সে দরজাটাতে একটু চাপ দিল, দরজাটা খুলল না। ভেতরে কোথায় একটা যান্ত্রিক শব্দ হলো এবং তখন হঠাৎ করে দরজাটা খুলে গেল। ঈশিতা বুক থেকে নিঃশ্বাসটা বের করে ফিস ফিস করে বলল, "থ্যাংকু, রাফি। থ্যাংকু শারমিন।" তারপর সে হেঁটে ভেতরে ঢুকে গেল।

আমার বই.কম
amarboi.com

সামনে লম্বা আলোকোজ্জ্বল করিডর। করিডরের শেষ মাথায় দুজন বিদেশি মানুষ কথা বলছে। ঈশিতা এই মুহূর্তে কারও সামনে পড়তে চায় না, তাই একটু এগিয়ে ডান দিকে ঢুকে গেল। সারি সারি ঘর, একেবারে শেষে বাথরুম। ঈশিতা বাথরুমে ঢুকে যায়। বাথরুমে কেউ নেই, সে ঝকঝকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে, তার মুখে আতঙ্কের একটা ছাপ। ঈশিতা মুখ থেকে আতঙ্কের ছাপটি সরিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে ফিস ফিস করে বলল, "ভয় নেই ঈশিতা! তুমি পারবে! নিশ্চয়ই পারবে।"

গতকাল রাফির ল্যাবে বসে পুরো বিল্ডিংটার কোথায় কী আছে, জানার চেষ্টা করেছিল। যদি ঠিকভাবে বুঝে থাকে, তাহলে সে এখন একতলার উত্তর দিকে আছে। সামনের করিডর ধরে হেঁটে পূর্ব দিকে গেলে সে একটি লিফট পাবে। লিফটের পাশে সিঁড়ি। সে লিফট কিংবা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে পারবে। তিনতলায় সারি সারি ঘরে রোগীদের রাখা আছে,

যেখানে বাইরের কেউ যেতে পারে না। ঈশিতার সেখানে যেতে হবে। বুক থেকে একটা বড় নিঃশ্বাস বের করে সে বাথরুম থেকে বের হয়।

ঈশিতা করিডর ধরে হাঁটতে থাকে, করিডরে একজন বিদেশি মানুষ আসছিল, তার চোখের দিকে না তাকিয়ে সে পাশ কাটিয়ে হেঁটে যায়। হেঁটে যেতে যেতে সে বুঝতে পারে, মানুষটি তাকে চোখের কোনা দিয়ে দেখছে। কেন দেখছে, কে জানে, কিছু একটা কি সন্দেহ করছে?

ঈশিতার অনুমান সঠিক, সে খানিক দূর হেঁটে লিফট এবং লিফটের পাশে সিঁড়িটি পেয়ে গেল। ঈশিতা লিফটে ওঠার ঝুঁকি নিল না, সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে থাকে। তিনতলায় এসে সে করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। পাশাপাশি অনেক রুম। প্রতিটি রুমের সামনে ছোট একটা নিউমেরিক কি-প্যাড। সে তার এমপ্লয়ি নম্বর ঢুকিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারবে। কোনো একটা ফাঁকা ঘরে সে ঢুকতে চায়, কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা সম্ভব নয়, ভেতরে কী আছে। করিডরের অন্য পাশ থেকে দুজন মানুষ কথা বলতে বলতে আসছে। ঈশিতা তাদের সামনে পড়তে চাইল না। তাই ঠিক কাছাকাছি যে রুমটি ছিল, তার দরজার নিউমেরিক কি-প্যাডে এমপ্লয়ি নম্বরটা ঢুকিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল।

আমারবই.কম
amarboi.com

এক পা সামনে এগিয়ে সে নিজের অজান্তেই দাঁড়িয়ে যায়। ঘরটিতে অনেক মানুষ, সবাই বিদেশি। ঘরবোঝাই যন্ত্রপাতি। তারা সেই যন্ত্রপাতির সামনে ঝুঁকে কাজ করছে। ঘরের এক কোনায় শুকনো একটি শিশু অচেতন হয়ে আছে। তার মাথা থেকে অনেক টিউব বের হয়ে এসেছে। ঈশিতাকে ঢুকতে দেখে সবাই মাথা তুলে তাকাল, তাদের চোখেমুখে বিস্ময়। একজন মানুষ অবাক হয়ে ইংরেজিতে বলল, "তুমি কে? এখানে কেন এসেছ?"

ঈশিতা বুঝতে পারল, সে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু সে হাল ছেড়ে দেবে না, চেষ্টা করে যাবে। মুখে সপ্রতিভ ভাবটা ধরে রেখে এক পা এগিয়ে বলল, "তুমি আমাকে এটা জিজ্ঞেস করছ কেন? আমি তো তোমাকে এই প্রশ্নটা করছি না!"

মানুষটা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "না, মানে। এটা হাই সিকিউরিটি রুম, এখানে আমরা কয়েকজন ছাড়া আর কারও ঢোকার কথা নয়।"

ঈশিতা বলল, "এত দিন কথা ছিল না। এখন কথা হয়েছে।" এবার সে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমার নাম রাইসা সুলতানা, আমি সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট।"

মানুষটা যন্ত্রের মতো বলল, "পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।"

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, এ রকম একজন মানুষ বলল, "তুমি এখানে কেন?"

ঈশিতা দ্রুত চিন্তা করতে থাকে। খুব বিশ্বাসযোগ্য একটা উত্তর দিতে হবে। তাহলে তাদের সন্দেহটা কিছুক্ষণের জন্য হলেও থামিয়ে রাখা যাবে। কোথায় যেন পড়েছিল সে, মিথ্যা কথা বলতে হয় সত্যের খুব কাছাকাছি। তাকে এখন সেটাই করতে হবে। ঈশিতা সেভাবে শুরু করল, "তোমরা জানো, এখানে কী হচ্ছে, তার কিছু কিছু বাইরে জানাজানি হয়েছে? কিছু সাংবাদিক সন্দেহ করতে শুরু করেছে?"

মানুষগুলো থতমত খেয়ে গেল। একজন বিড়বিড় করে বলল, "হ্যাঁ, আমরা শুনেছি। কেউ কেউ নাকি সন্দেহ করেছে।"

"তোমরা জানো, একটা কেস গোপন রাখার জন্য লোকাল সিকিউরিটি একটা খুব বড় ক্রাইম করেছে।"

"কী রকম ক্রাইম?"

"মার্ডার।"

নীল চোখের একজন মানুষ শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে বলল, "বড় একটা কাজে এ রকম কিছু হয়।"

amarboi.com

ঈশিতা বলল, "অবশ্যই হয়। কিন্তু আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। এ দেশের মিডিয়া খুব ডেঞ্জারাস। কোনো কিছু ধরলে ছাড়ে না।"

"আমরা ভেবেছিলাম, টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা আছে।"

"এই পদ্ধতি ভালো না। তখন সবাই আরও বেশি জানতে চায়। মুখ বন্ধ করার রেট দেখতে দেখতে আকাশছোঁয়া হয়ে যায়।"

মানুষগুলো নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলতে থাকে। আপাতত কিছুক্ষণের জন্য তাদের থামানো গেছে। ঈশিতা এবার একটু বেশি সাহসী হয়ে উঠল। বলল, "আমি তোমাদের কাজে ডিস্টার্ব করব না—যে জন্য এসেছি, সেটা শেষ করে চলে যাই।"

"কী জন্য এসেছ?"

"আমি বাচ্চাটার একটা ছবি নিতে এসেছি।"

মানুষগুলো চমকে উঠল, "ছবি? ছবি নেবে কেন?"

"দেখব, এটা মিডিয়াকে দেওয়া যায় কি না।"

মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

আমরা একটা বাচ্চার ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট লাগিয়ে স্টিমুলেশান দিচ্ছি, সেই ছবি তুমি মিডিয়াকে দেবে?"

ঈশিতা সহৃদয়ভাবে হাসল। বলল, "তোমার ভয় নেই। আমি মোটেও বলিনি মিডিয়াকে দেব। আমি বলেছি মিডিয়াকে দেওয়া যায় কি না, সেটা দেখব।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "এই পুরো প্রজেক্টের গোড়ার কথা হচ্ছে গোপনীয়তা, আর তুমি বলছ, এর ছবি মিডিয়াকে দেওয়া যায় কি না, ভাবছ?"

"হুবহু এই ছবি দেওয়া হবে না। এটাকে টাচআপ করা হবে—ফটোশপ দিয়ে মাথার টিউব সরানো হবে, মোটেও বলা হবে না যে আমরা তার ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়েছি। আমরা বলব, এই ছেলেটিকে আমরা বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

একজন মানুষ বলল, "না, না। এই আইডিয়াটা ভালো না।"

ঈশিতা তার মুখের হাসি বিস্তৃত করে বলল, "এই আইডিয়াটা ভালো না খারাপ, সেটা নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না। তার জন্য প্রফেশনালরা আছে। স্পর্শকাতর বিষয় কীভাবে পাবলিককে খাওয়াতে হয়, তার জন্য সোশ্যাল সাইকোলজি নামে নতুন ডিসিপ্লিন তৈরি হয়েছে।"

আমার বই. কম
amarboi.com

মানুষগুলো কোনো কথা না বলে স্থিরদৃষ্টিতে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে রইল। ঈশিতা তার ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে বিছানায় শুয়ে থাকা অসহায় শিশুটির কয়েকটা ছবি তোলে। ছবি তোলা শেষ করে সে ক্যামেরাটা বন্ধ না করে ভিডিও মোডে নিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখে। এখন সে যে দিকেই ঘুরবে, ক্যামেরা ভিডিও করে নেবে। এই মানুষগুলোর ভেতরে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে সে যতটুকু সম্ভব তাদের ছবি তুলে নিতে চায়।

ঈশিতা মানুষগুলোর দিকে ঘুরে বলল, "তোমরা তোমাদের কাজ করো। কী মনে হয়, তোমরা কি আরেকটা মাইলফলক দিতে পারবে?"

"এটা কী বলছ, আমরা আরও দুইটা মাইলফলক করে ফেলেছি, সেগুলো কাউকে জানাতে পারছি না।"

"ছেলেটা বেঁচে থাকবে?"

"সেটাই তো মুশকিল। শরীরের সব মেজর অর্গান ফেল করতে শুরু করেছে। কোনোভাবে আর চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখতে পারলে আরও একটা বড় ব্রেক থ্রু হবে।"

ঈশিতার ভেতরটা কেমন যেন শিউরে উঠল, বাইরে সে প্রকাশ করল না। সহজ গলায় বলল, "আমার সব সময়ই একটা জিনিস নিয়ে কৌতূহল, আমি সাইকোলজি পড়েছি, কিন্তু টেক্সট বুকে এগুলো থাকে না। যখন তোমরা ছেলেটার ব্রেনটাকে হাই স্টিমুলেশান দিয়ে ব্যবহার করো, তখন ছেলেটা কী কিছু অনুভব করে?"

নীল চোখের মানুষটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "আমরা জানি না। মনে হয়, তার অনুভূতিটা হয় কোনো একটা স্বপ্ন দেখার মতো।"

এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি যে মানুষটি, সে মোটা গলায় বলল, "স্বপ্ন নয়, বলা উচিত, দুঃস্বপ্ন। বাচ্চাটা কী রকম ছটফট করে, দেখেছ? আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ওর কষ্ট হয়।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি হাত নাড়িয়ে বলল, "আমরা ওসব নিয়ে কথা না বললাম।"

ঈশিতা বলল, "হ্যাঁ, কথা না বললাম।" সে দরজার দিকে এগোতে এগোতে থেমে গিয়ে বলল, "তোমাদের যদি আমার কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। আমি সিস্টেমে আছি।"

দাড়ি-গোঁফওয়ালা মানুষটি বলল, "এক সেকেন্ড রাইসা, আমি একটু দেখে নিই। তুমি কিছু মনে কোরো না, এই ঘরে তোমার উপস্থিতি আমাদের জন্য খুব বড় একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।"

ঈশিতা সহৃদয়ভাবে হাসল। বলল, "আমি কিছু মনে করব না। তুমি সিস্টেমে আমার প্রোফাইল দেখে নিশ্চিত হয়ে নাও যে আমি তোমাদের একজন। আমি পুলিশ বাহিনীর একজন সিক্রেট এজেন্ট না।"

মানুষটা কম্পিউটারের স্ক্রিনে ঈশিতার ছবি, নাম-পরিচয় বের করে এনে একনজর দেখে মাথা নাড়ল। বলল, "থ্যাংকু রাইসা। তুমি তোমার কাজ করো।"

ঈশিতা ঘর থেকে বের হয়ে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার ক্যামেরায় যেটুকু তথ্য আছে, সেটা এদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। ছেলেটির ছবি থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ওই মানুষগুলোর ভিডিও। ঘরের ভেতর যথেষ্ট আলো ছিল, ভিডিওটা খারাপ হওয়ার কথা নয়। যন্ত্রপাতির একটা শব্দ থাকলেও কথাবার্তা ভালোভাবে রেকর্ড হয়ে যাওয়ার কথা। এখন তাকে এখান থেকে বের হয়ে যেতে হবে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিডর ধরে ডান দিকে।

আমার বই. কম
amarboi.com

ঈশিতা দ্রুত হাঁটতে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে করিডর ধরে হেঁটে দরজার কাছে পৌঁছায়। ঢোকার সময় আঙুলের ছাপ, চোখের রেটিনা স্ক্যান করে ঢুকতে হয়েছিল। বের হওয়া খুব সহজ, দরজার নব ঘোরালেই দরজা খুলে যাবে। ঈশিতা নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলতেই চমকে উঠল। দরজার অন্য পাশে বব লাস্কি দাঁড়িয়ে আছে।

ঈশিতা বব লাস্কিকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে যাচ্ছিল। বব লাস্কি তাকে থামাল, "এই যে তুমি, শোনো।"

ঈশিতা দাঁড়াল। বব লাস্কি বলল, "তুমি কে?"

"আমি রাইসা সুলতানা। একজন নতুন এমপ্লয়ি।"

"সেটা অবশ্যি দেখতে পাচ্ছি। এনডেভার থেকে বের হতে চাইলে আগে সেখানে ঢুকতে হয়। আমাদের সিকিউরিটি সিস্টেম এমপ্লয়ি ছাড়া কাউকে ঢুকতে দেবে না। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের এমপ্লয়ি।"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ। আমি কি এখন যেতে পারি? ছোট একটা ইমার্জেন্সি ছিল।"

"তুমি অবশ্যই যাবে রাইসা সুলতানা। কিন্তু আমাকে এক সেকেন্ড সময় দাও। এখানে যাদের নেওয়া হয়েছে, আমি তাদের সবার ইন্টারভিউ নিয়েছি। সবার চেহারা আমি মনে রেখেছি। তোমার চেহারাও আমার মনে আছে, তোমাকেও আমি দেখেছি। কিন্তু খুব আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো?"

ঈশিতার শরীর শীতল হয়ে আসতে থাকে। চেষ্টা করে বলল, "কী?"

"তোমাকে আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে দেখিনি। তোমাকে আমি দেখেছি আমার অফিসে। আমি তোমার ইন্টারভিউ নিইনি, তুমি আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিলে।"

ঈশিতা স্থির চোখে বব লাস্কির দিকে তাকাল। সে ধরা পড়ে গেছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে সে ধরা পড়ে গেছে। বব লাস্কি নিচু গলায় বলল, "রাইসা সুলতানা কিংবা যেটি তোমার আসল নাম—তুমি কি আমার সঙ্গে একটু ভেতরে আসবে? এটি একটি ভদ্রতার কথা, কারণ তুমি যদি আসতে না চাও, তোমাকে জোর করে নেওয়া হবে। ওই দেখো দুজন সিকিউরিটি আমার ইঙ্গিতের জন্য দাঁড়িয়ে আছে।"

ঈশিতা খুব সাবধানে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

৮.

বড় কালো একটা টেবিলের এক মাথায় ঈশিতা বসে আছে। অন্য মাথায় বসেছে বব লাস্কি। ঈশিতার ঠিক পেছনে দুজন পাহাড়ের মতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, একজন ধবধবে সাদা, অন্যজন কুচকুচে কালো। টেবিলের দুই পাশে বেশ কিছু মানুষ, সবাই বিদেশি। ঈশিতা তাদের অনেককেই চিনতে পারল, একটু আগে সে তাদের ধোঁকা দিয়ে ছবি এবং ভিডিও তুলে এনেছিল। মানুষগুলো এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে ঈশিতার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমার বই.কম
amarboi.com

বব লাস্কি একটু সামনে ঝুঁকে বলল, "বলো মেয়ে, তুমি কেমন করে এনডেভারে ঢুকেছ?"

ঈশিতা কোনো কথা না বলে স্থির দৃষ্টিতে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে রইল। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "বব, সে এখানকার এমপ্লয়ি। তার সর্বোচ্চ সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে। সে সেন্ট্রাল দরজা দিয়ে হেঁটে ঢুকে গেছে।"

বব লাস্কি বলল, "এটুকু আমিও জানি। কিন্তু সমস্যা হলো, সে এখানকার এমপ্লয়ি না। আমরা তাকে এখানে চাকরি দিইনি, সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স তো দূরের কথা।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বলল, "আমি নিজের চোখে দেখেছি, তার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স আছে।"

"আমি সেটাই জানতে চাচ্ছি, কেমন করে আমাদের সিস্টেম তাকে এত বড় ক্লিয়ারেন্স দিল। কে দিল?"

টেবিলের এক কোনায় একজন একটা ল্যাপটপে ঝুঁকে কাজ করছিল। সে বলল, "আমাদের কেউ দেয়নি, স্যার। আমি পুরো সিস্টেম চেক করেছি।"

বব লাস্কি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "তাহলে কে দিয়েছে?"

মানুষটা ল্যাপটপে আরও ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমাকে দুই মিনিট সময় দেন, স্যার। আমি সিস্টেমের পুরো লগ বের করে আনছি। ঠিক কীভাবে সে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পেয়েছে, আমি বের করে ফেলছি।"

বব লাস্কি এবার ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আমার রেকর্ড থেকে বের করে দেখেছি, তোমার নাম হচ্ছে ঈশিতা। তুমি আমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলে।"

ঈশিতা কোনো কথা বলল না। বব লাস্কি বলল, "এনডেভার একটা প্রাইভেট কোম্পানি। এখানে বাইরের কেউ ঢোকার কথা নয়। তুমি এখানে ঢুকে পুরোপুরি বেআইনি কাজ করেছ।"

ঈশিতা এই প্রথমবার মুখ খুলল। বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "সত্যিই যদি আমি বেআইনি কাজ করে থাকি, আমাকে পুলিশে দাও। আরও ভালো হয়, যদি পুলিশকে এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

বব লাস্কি বলল, "তুমি খুব ভালো করে জানো, আমরা তোমাকে পুলিশে দেব না। তোমাদের দেশের আইন-কানুনের ওপর ভরসা করে আমরা এখানে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান শুরু করিনি। যেটুকু আইনের সাহায্য দরকার, সেটুকু আমরা ডলার দিয়ে কিনে নিয়েছি, ক্যাশ ডলার।"

আমার বই. কম
amarboi.com

ঈশিতা জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আমাকে এই তথ্যটুকু দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ, মিস্টার লাস্কি।"

"তোমাকে এই তথ্যটা দিচ্ছি, কারণ এটা কোনো দিন তোমার ভেতর থেকে বের হবে না।"

ঈশিতার বুক কেঁপে উঠল, মুখে সেটা সে প্রকাশ হতে দিল না। জিজ্ঞেস করল, "কেন বের হবে না?"

"কারণ, তুমি বলে এই পৃথিবীতে কারও অস্তিত্ব থাকবে না।"

"তুমি আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছ?"

বব লাস্কি বলল, "হুমকি নয়, আমি তোমাকে জানাচ্ছি।"

ঈশিতা টেবিলের দুই দিকে বসে থাকা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা নিশ্চয়ই অনেক বড় বিজ্ঞানী কিংবা ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ম্যাথমেটিশিয়ান। পৃথিবীর সেরা সেরা জার্নালে নিশ্চয়ই তোমাদের গবেষণা পেপার ছাপা হয়েছে। অথচ তোমরা চুপচাপ বসে দেখছ, এই মানুষটি আমাকে খুন করে ফেলার কথা বলছে। তোমাদের কারও ভেতর এটা নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই?"

নীল চোখের মানুষটি শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "মেয়ে, তুমি ব্যাপারটাকে কেন ড্রামাটিক করার চেষ্টা করছ, কোনো লাভ নেই। হিরোশিমার ওপর যখন এনোলা গে থেকে পৃথিবীর প্রথম নিউক্লিয়ার বোমা ফেলা হয়েছিল, তখন সেই পাইলটদের হাত একটুও কাঁপেনি। তারা এক মুহূর্তে এক লাখ লোক মেরেছিল, কিন্তু তাদের কারও মনে হয়নি, তারা হত্যাকারী। বিশ্বযুদ্ধ শেষ করার জন্য সেই হত্যাকাণ্ডের দরকার ছিল। এখানেও তা-ই।"

ঈশিতা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে বলল, "এখানেও তা-ই?"

"হ্যাঁ। পৃথিবীর সভ্যতা আর কম্পিউটার এখন সমার্থক। মাইক্রোপ্রসেসরের ক্ষমতা বাড়তে বাড়তে এক জায়গায় থেমে যাচ্ছে, কোয়ান্টাম মেকানিকস বলছে, আর ক্ষমতা বাড়ানো সম্ভব নয়। অথচ আমাদের মানুষের মস্তিষ্ক এসব কম্পিউটার থেকে হাজার-লক্ষ গুণ শক্তিশালী। আমরা সেটাকে যন্ত্রপাতির সঙ্গে জুড়ে দিতে শিখিনি। যখন জুড়ে দিতে পারব, তখন পৃথিবী থেকে কনভেনশনাল কম্পিউটার উঠে যাবে। এই কম্পিউটারের তুলনায় সেটা হয়ে যাবে একটা খেলনা।"

বব লাস্কি বলল, "জর্জ, তুমি যেন শুধু শুধু এই মেয়েটার সঙ্গে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করছ।"

আমার বই . কম
amarboi.com

জর্জ নামের নীল চোখের মানুষটি বলল, "সময় নষ্ট করছি, কারণ এই মেয়ে আমাদের সততা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি, মানুষের ভবিষ্যৎ সভ্যতার জন্য যে গবেষণার দরকার, আমরা সেই গবেষণা করছি। পৃথিবীর মানুষ সেই গবেষণার কথা শুনতে এখনো প্রস্তুত হয়নি, সে জন্য আমরা থেমে থাকব না—"

জর্জ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ল্যাপটপ হাতে মানুষটি একটা আর্তচিৎকারের মতো শব্দ করল। বব লাস্কি বলল, "কী হয়েছে?"

মানুষটা ভাঙা গলায় বলল, "আমি এটা বিশ্বাস করি না।"

"তুমি কী বিশ্বাস করো না?"

"এখানে যেটা ঘটেছে।"

"এখানে কী ঘটেছে?"

"গতকাল সকাল নয়টা তিরিশ মিনিটে কেউ আমাদের সিস্টেমে ঢুকেছে। ডেটাবেস থেকে এনক্রিপটেড পাসওয়ার্ড ডাউনলোড করেছে নয়টা সাতান্ন মিনিটে। দশটা বিয়াল্লিশ মিনিটে পাসওয়ার্ডকে ডিক্রিপ্ট করে সিস্টেম ব্রেক করেছে।"

টেবিলের চারপাশের সব মানুষ পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল। মনে হলো, ঘরের মধ্যে একটা বজ্রপাত হয়েছে। বব লাস্কি অনেক কষ্ট করে বলল, "কী, কী বললে? আমাদের এনক্রিপশান ডিকোড করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"আ-আ-আমাদের এনক্রিপশন?"

"হ্যাঁ।"

"এক ঘণ্টার কম সময়ে?"

"হ্যাঁ।"

"কোন পদ্ধতিতে? কোন কম্পিউটার ব্যবহার করেছে?"

ল্যাপটপের মানুষটি দীর্ঘশ্বাসের মতো একটা শব্দ করল। তারপর বলল, "কোনো পদ্ধতি নয়, সরাসরি। কোনো একজন মানুষ কি-বোর্ডে একটা একটা সংখ্যা টাইপ করেছে।"

বব লাস্কি এখনো ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। বলল, "কোনো একজন মানুষ? এক ঘণ্টার ভেতর আমাদের এনক্রিপশন ভেঙেছে?"

"হ্যাঁ"।

"আমরা হাফ বিলিয়ন ডলার দিয়ে যেটা তৈরি করিয়েছি? যেটা সারা পৃথিবীতে ব্যবহার করে?"

আমারবই.কম
amarboi.com

"হ্যাঁ। কোনো একজন মানুষ সেটা ভেঙেছে।"

বব লাস্কি একবার ঈশিতার দিকে তাকাল, তারপর টেবিলের চারপাশে বসে থাকা মানুষগুলোকে বলল, "আমরা যে নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করার চেষ্টা করছি, তার থেকে লক্ষ-কোটি গুণ ক্ষমতার মানুষ আছে?"

ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা মানুষটি বলল, "একবার সিস্টেমে ঢোকার পর তারা এই মেয়েটির পুরো তথ্য ডেটাবেসে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"আঙুলের ছাপ আর রেটিনা স্ক্যানিং?"

"ওভার রাইট করে দিয়েছে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আমাদের এনডেভার এখন কারও আঙুলের ছাপ আর রেটিনা চেক করে না। সবাইকেই ঢুকতে দিচ্ছে!"

বব লাস্কি নিজের মাথা চেপে ধরে বলল, "ও মাই গড!"

ল্যাপটপের সামনে বসে থাকা মানুষটি বলল, "আমাদের এনডেভার আর একটা ফাস্টফুডের দোকানের সিকিউরিটি এখন একই সমান!"

বব লাস্কি তার মাথা চাপড়ে দ্বিতীয়বার বলল, "ও মাই গড!"

নীল চোখের সুদর্শন মানুষটি বলল, "বব, তোমার এত বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। বলতে পার, আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ একটা সুযোগ পেয়েছি।"

"কী সুযোগ?"

"এ দেশে একজন মানুষ আছে, যার মস্তিষ্ক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সুপার কম্পিউটার থেকে বেশি ক্ষমতাশালী। আমরা যে নিউরাল কম্পিউটার তৈরি করতে চাইছি, তার থেকে লক্ষ গুণ বেশি শক্তিশালী। কাজেই আমাদের কাজ এখন পানির মতো সোজা।"

"কী রকম?"

"ওই মানুষটাকে ধরে আনো। আমরা তার ব্রেন স্ক্যান করি। তারপর সেটা উপস্থাপন করি।"

বব লাস্কি নীল চোখের মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, "তার মানে, আমাদের এনডেভারের এই সেটআপের দরকার নেই?"

"না, আমাদের ওই মানুষটি দরকার। জীবিত হলে সবচেয়ে ভালো। জীবিত পাওয়া না গেলে মৃত। মৃত পুরো শরীরটা পাওয়া না গেলেও ক্ষতি নেই। শুধু মস্তিষ্কটা হলেই হবে। লিকুইড নাইট্রোজেনে ফ্রিজ করে হেড অফিসে পাঠিয়ে দাও।"

আমারবই.কম
amarboi.com

বব লাস্কি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "মেয়ে, তুমি আমাদের বলো, এই মানুষটা কে? কোথায় আছে?"

ঈশিতা শব্দ করে হেসে উঠল, তাকে হাসির ভান করতে হলো না, সে সত্যি সত্যি হাসতে পারল। হাসতে হাসতে বলল, "মানবসভ্যতার যুগান্তকারী পরিবর্তনের জন্য তুমি মনুষ্যরূপী নিউরাল কম্পিউটার চাইবে, আর সাথে সাথে পেয়ে যাবে? এ দেশের মানুষ এত সহজ?"

বব লাস্কি হিংস্র গলায় বলল, "বলো, সেই মানুষটা কে?"

ঈশিতার হাসি আরও বিস্তৃত হলো। বলল, "তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো যে তুমি চোখ রাঙিয়ে ধমক দেবে, আর আমি ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলে দেব?"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "একে দুই সিসি ক্লিপোনাল পুশ করো। সবকিছু বলে দেবে—"

নীলচোখের মানুষটি বলল, "দুই সিসি নয়, চার সিসি দাও, তাহলে সবকিছু বলে দিয়ে ব্রেন ডেড হয়ে থাকবে।"

বব লাস্কি বলল, "দাঁড়াও। ক্লিপোনাল দেওয়ার আগে আমি আমাদের লোকাল সিকিউরিটিকে ডাকি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভেতর দুজন মানুষ এসে ঢুকল। একজন মধ্যবয়স্ক, অন্যজন একটু কম বয়সী। চুল ছোট করে ছাঁটা এবং পরনে ধূসর সাফারি কোট। ঈশিতা তাদের চিনতে পারে এবং ওই দুজনও তাকে চিনতে পারে। ঈশিতা তাদের প্রথম দেখেছে তার পত্রিকার সম্পাদক নুরুল ইসলামের অফিসে। সমীরকেও এরা হুমকি দিয়ে এসেছে। হাজেরা যেদিন মারা যায়, সেদিন তার বাড়ির কাছে এই দুজনকে দেখেছিল ঈশিতা।

বব লাস্কি বলল, "তোমাদের জরুরি কাজে ডেকে এনেছি। আমাদের এনডেভারে মেজর সিস্টেম ফেল করেছে। কোনো একজন মানুষ সিস্টেমে হ্যাক করেছে। এই মেয়েটা জানে, কিন্তু সে বলছে না।"

"মুখ থেকে কথা বের করতে হবে?" মানুষটির মুখে তৈলাক্ত এক ধরনের হাসি ফুটে ওঠে, "আমাকে আধঘণ্টা সময় দাও, আর এই মেয়েটাকে দাও। নিরিবিলি—"

বব লাস্কি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি তোমাদের টর্চার করার জন্য ডাকিনি। আমি জানতে চাইছি, তোমরা কি কোনো মানুষের কথা জানো, যে খুব দ্রুত হিসাব করতে পারে কম্পিউটারের মতো?"

"হ্যাঁ, জানি। সমীর ছোঁকরাটাকে টাইট দিতে যে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখেছি। ছোট একটা মেয়ে আছে, যে মুখে মুখে গুণ-ভাগ করে দেয়।"

বব লাস্কি টেবিলে একটা ঘুষি দিয়ে বলে, "ইউরেকা! পেয়ে গেছি।"

ঈশিতাকে দেখিয়ে বলল, "এই সাংবাদিক মেয়েটা সেখানে ছিল। ওই মেয়েটার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।"

বব লাস্কি উত্তেজিত মুখে বলল, "আমাদের ওই মেয়েটা দরকার। যেভাবে সম্ভব।"

"কত দিনের মধ্যে দরকার?"

"কত দিন নয়, বলো, কত মিনিট।"

"কত মিনিট?"

"হ্যাঁ। এয়ারপোর্টে যাও। আমাদের হেলিকপ্টার নিয়ে ফ্লাই করো, দুই ঘণ্টার মধ্যে নিয়ে এসো।"

"গোপনে?"

amarboi.com

"অবশ্যই গোপনে।" বব লাস্কি বিরক্ত মুখে বলল, "তোমাদের মিডিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ মিডিয়া। একটা কিছু পেলে তার পেছনে লেগে থাকে।"

"ঠিক আছে।"

"চেষ্টা কোরো জীবিত আনতে।"

"সম্ভব না হলে ডেডবডি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু ডেডবডি হলে ডিকম্পোজ করা যাবে না। ফ্রিজ করে আনতে হবে।"

"ঠিক আছে।"

মানুষ দুজন যখন বের হয়ে যাচ্ছিল, তখন ঈশিতা তাদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। নিচু গলায় বলল, "আপনারা কি দরকার হলে আপনাদের মায়েদেরও বিক্রি করে দেন?"

"এ কথা কেন বলছ?"

"যে নিজের দেশকে বিক্রি করতে পারে, সে নিশ্চয়ই নিজের মাকেও বিক্রি করে দিতে পারে, সে জন্য বলছি।"

মধ্যবয়স্ক মানুষটির মুখ যেন ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল। সে ঈশিতার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "আমি আমার দেশ বিক্রি করছি না। আমি তোমার দেশ বিক্রি করছি।"

আমার বই কম
amarboi.com

"আপনার দেশ কোনটি?"

"আমার দেশ নাই। একাত্তরে আমি আমার দেশ হারিয়েছি। বুঝেছ?"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "বুঝেছি।" সে আসলেই অনেক কিছু বুঝতে পেরেছে।

রাফি ঘড়ির দিতে তাকাল, প্রায় দুইটা বাজে। ঈশিতার সঙ্গে কথা ছিল, সে এনডেভার থেকে বের হয়েই তাকে ফোন করবে। এখনো ফোন করেনি, তার মানে ঈশিতা এখনো এনডেভার থেকে বের হতে পারেনি। সে নিজে থেকে বের না হলে ঠিক আছে, কিন্তু ভেতরে গিয়ে আটকা পড়ে থাকলে বিপদের কথা। রাফি কী করবে, এখনো বুঝতে পারছে না। যদি কোনো খোঁজ না পায়, তাহলে শারমিনকে নিয়ে আবার কম্পিউটারে বসতে হবে। আবার এনডেভারের ভেতর ঢুকতে হবে।

ঠিক তখনই তার ফোনটা বাজল। আশা করছিল, ঈশিতার ফোন হবে, কিন্তু দেখা গেল ফোনটা সমীরের। রাফি ফোন ধরে বলল, "হ্যালো, সমীর।"

সমীর উত্তেজিত গলায় বলল, "রাফি, তোমার মনে আছে, দুজন মোষের মতো মানুষ আমাকে ভয় দেখিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। মনে আছে।"

"সেই মানুষ দুটিকে ক্যাম্পাসে দেখেছি।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। একটা সাদা রঙের পাজেরো থেকে নেমেছে।"

"নেমে কী করছে?"

"আমি দূর থেকে দেখলাম, মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে টংগুলোর দিকে যাচ্ছে।"

"সর্বনাশ।"

সমীর বলল, "হ্যাঁ, সর্বনাশ। বদমাইশ দুটো কেন এসেছে বলে মনে হয়?"

"যেহেতু টংগুলোর দিকে এগোচ্ছে, তার মানে, নিশ্চয়ই শারমিনের খোঁজে যাচ্ছে।"

"কেন? শারমিনের খোঁজে কেন? শারমিন কী করেছে?"

রাফি বলল, "এখনো বুঝতে পারছি না। দেখি, কী করা যায়।"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি ফোন শেষ করে ঘর থেকে বের হলো। ছাত্রছাত্রীদের ভিড় ঠেলে সে টংয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

শারমিনের বাবা রাফিকে দেখে এগিয়ে এল। মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "আসেন, স্যার। বসেন।"

"শারমিন কোথায়?"

"ঢাকা থেকে দুজন স্যার আসছেন। তাঁরা শারমিনের সঙ্গে একটু কথা বলতে নিয়ে গেছেন।"

রাফি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কোথায় নিয়ে গেছে?"

"এই তো এখানে কোনো এক জায়গায়। মনে হয় ক্যানটিনে।"

রাফি ছটফট করে বলল, "আপনি আপনার মেয়েকে দুজন অপরিচিত মানুষের সঙ্গে ছেড়ে দিলেন?"

রাফির অস্থিরতাটুকু শারমিনের বাবার ভেতরে সঞ্চারিত হলো। মানুষটি ভয় পাওয়া গলায় বলল, "কেন, স্যার? কোনো সমস্যা? দেখলাম, বয়স্ক ভদ্রলোক মানুষ। আমার সঙ্গে খুব ভদ্রলোকের মতো কথা বলল—"

রাফি বাধা দিয়ে বলল, "শারমিন? শারমিন যেতে চাইল?"

"না। যেতে চাচ্ছিল না। বলছিল, আগে আপনার সঙ্গে কথা বলবে। তখন ভদ্রলোক দুজন বলল, ঠিক আছে। আপনার কাছেও নিয়ে যাবে। তখন—"

রাফি কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল না, দূরে তাকিয়ে দেখল, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের কাছে একটা সাদা পাজেরো দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয়, ওটাতে করেই এসেছে। যদি কোনোভাবে শারমিনকে টেনে তুলে ফেলে, তাহলেই আর তাকে খুঁজে পাবে না। মানুষগুলোর যে রকম বর্ণনা শুনেছে, তাতে সে নিশ্চিত, তাদের কাছে অস্ত্র আছে, বাধা দিলে গুলি করে বের হয়ে যাবে। রাফি অনুভব করে, তার পিঠ দিয়ে একটা শীতল ঘাম বইতে শুরু করেছে। ঠিক তখন তার ভোটকা হান্নানের কথা মনে পড়ল, সম্ভবত সে-ই এখন তাকে রক্ষা করতে পারবে।

রাফি ফোন বের করে ভোটকা হান্নানের নম্বরে ডায়াল করল। একটা আধুনিক ইংরেজি গান শোনা গেল এবং হঠাৎ করে গানটি থেমে গিয়ে ভোটকা হান্নানের গলার স্বর শোনা গেল, "আস্সালামু আলাইকুম, স্যার।"

"হান্নান, তুমি কোথায়?"

"মুক্তিযুদ্ধ চত্বরে। কেন, স্যার?"

"কী করছ?"

আমার বই . কম
amarboi.com

"সংগঠনের একটা ছোট বিষয় নিয়ে একটা ঝামেলা—"

রাফি কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি একটু সাহায্য করতে পারবে? খুব জরুরি—"

"পারব, স্যার। কী করতে হবে, বলেন।"

রাফি বলল, "না শুনেই বলে দিলে পারবে?"

"আপনি তো আর আমাকে এমন কিছু বললেন না, যেটা আমার পক্ষে করা সম্ভব নয়। করা সম্ভব হলে কেন পারব না? কী করতে হবে, বলেন।"

"মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যটার কাছে একটা সাদা পাজেরো আছে, দেখেছ?"

"দেখেছি, স্যার।"

"ওই পাজেরোয় করে দুজন মানুষ এসেছে শারমিনকে তুলে নিতে। তোমরা শারমিনকে বাঁচাও।"

"মানুষ দুজন কে?"

"জানি না। অসম্ভব ক্ষমতাশালী। আর্মড। যেকোনো মানুষকে খুন করার পারমিশন আছে।"

"মানুষগুলো কই?"

"শারমিনকে নিয়ে বের হয়েছে। ক্যাম্পাসে কোথাও আছে। মনে হয় ক্যানটিনের দিকে গিয়েছে।"

"ঠিক আছে, স্যার। আমরা ব্যবস্থা করছি। শারমিনকে আপনার কাছে দিয়ে যাব?"

"হ্যাঁ, দিয়ে যেতে পারো। আর শোনো, মানুষগুলো কিন্তু আর্মড এবং অসম্ভব ডেঞ্জারাস।"

"আপনি চিন্তা করবেন না।"

টেলিফোন লাইনটা কেটে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাফি দূর থেকে একটা স্লোগান শুনল, "জ্বালো জ্বালো—আগুন জ্বালো!"

দেখতে দেখতে একটা ছোট জঙ্গি মিছিল বের হয়ে গেল। মিছিলের সামনে শুকনো লিকলিকে হান্নান, পেছন ফিরে গলা উঁচিয়ে স্লোগান ধরছে, অন্যেরা তার উত্তর দিচ্ছে। দূর থেকে সব স্লোগান শোনা যাচ্ছে না, "অ্যাকশান অ্যাকশান, ডাইরেক্ট অ্যাকশান" এবং "প্রশাসনের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে" এই দুটি স্লোগান সে বুঝতে পারল। মিছিলটা খুব বড় নয়। মুক্তিযুদ্ধ চত্বরের আশপাশে ঘুরপাক খেতে থাকে, কখনোই সাদা পাজেরো থেকে বেশি দূরে সরে যাচ্ছে না।

আমার বই.কম
amarboi.com

রাফি দূর থেকে লক্ষ করে, হঠাৎ মিছিলটি মুক্তিযুদ্ধ চত্বর থেকে বের হয়ে রাস্তায় উঠে আসে, কারণটাও সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে। রাস্তা ধরে সাফারি কোট পরা দুজন মানুষ হেঁটে আসছে; একজন শারমিনের হাত শক্ত করে ধরে রেখেছে, শারমিনের চোখে-মুখে এক ধরনের অসহায় আতঙ্ক। মানুষ দুজন শারমিনকে নিয়ে রাস্তার একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মিছিলটিকে চলে যাওয়ার জন্য জায়গা দিল। মিছিলটি কিন্তু চলে না গিয়ে একেবারে হুড়মুড় করে মানুষ দুজনের ওপর গিয়ে পড়ল। একটা জটলা, জটলার মাঝে হুটোপুটি হচ্ছে, চিৎকার-হইচই-চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। রাফির মনে হলো, ভেতরে মারপিট শুরু হয়েছে। সে একটু এগিয়ে যাবে কি না ভাবছিল, ঠিক তখন দেখল ভিড়ের মাঝখান থেকে ভোটকা হান্নান শারমিনের হাত ধরে বের হয়ে তাকে নিয়ে ছুটছে।

যেভাবে মারামারি শুরু হয়েছিল, ঠিক সেভাবেই সেটা শেষ হয়ে গেল। ছাত্রদের দলটি হঠাৎ করে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর রাফি মানুষ দুটিকে দেখতে পায়, শার্টের বোতাম ছেঁড়া, বিধ্বস্ত চেহারা। একজন মানুষ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বারবার তার বগলে, পেটের কাছে হাত দিয়ে কিছু একটা খুঁজছে। তার কিছু একটা হারিয়ে গেছে।

রাফি অফিসে এসে দেখল, ভোটকা হান্নান একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছে। কাছাকাছি আরেকটা চেয়ারে শারমিন মুখ কালো করে বসে আছে। রাফিকে দেখে হান্নান উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিল, তার মুখে এগাল-ওগাল জোড়া হাসি। হাসিকে আরও বিস্তৃত হতে দিয়ে বলল, "স্যার, আপনার শারমিনকে নিয়ে এসেছি।"

"হ্যাঁ, দেখেছি। থ্যাংকু।"

"যখন যেটা দরকার হয়, বলবেন স্যার।"

"হ্যাঁ, বলব।"

"আপনি তাহলে শারমিনকে দেখবেন, স্যার।"

"হ্যাঁ, দেখব।"

"আমি তাহলে যাই?"

"আমাকে আরেকটু সাহায্য করতে পারবে?"

"কী সাহায্য, স্যার?"

"দশ-বারো বছরের ছেলের জন্য একটা প্যান্ট আর শার্ট কিনে দিতে পারবে?"

হান্নান বলল, "ঠিক আছে, স্যার।"

আমারবই.কম
amarboi.com

হান্নান যখন চলে যাচ্ছিল, তখন রাফি তাকে ডাকল। বলল, "হান্নান, আরও একটা জিনিস।"

"কী জিনিস?"

"ওই লোকগুলোকে দেখে মনে হলো, তাদের কিছু একটা হারিয়ে গেছে।"

হান্নানের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বলল, "আপনাদের ওই সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। এগুলো আমাদের ব্যাপার।"

"তোমাদের ব্যাপার?"

"জি, স্যার। আজকে বিশাল বিজনেস হলো। থ্যাংকু স্যার।"

রাফি কী বলবে বুঝতে না পেরে বলল, "ইউ আর ওয়েলকাম।" কথাটি বলে তার নিজেকে কেমন জানি বোকা বোকা মনে হতে থাকে।

হান্নান চলে যাওয়ার পর শারমিন রাফির কাছে এসে বলল, "স্যার, আমার খুব ভয় করছে।"

রাফি বলল, " তোমার ভয় পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এখন আর ভয় নেই।"

"কেন ভয় নেই, স্যার? ওরা যদি আবার আসে?"

"আসলে আসবে। আমি আছি না?"

"স্যার।"

"বলো, শারমিন।"

"ওই লোক দুটি খুব খারাপ।"

"তুমি কেমন করে জানো?"

"আমাকে বলেছে, আমাকে নাকি কেটে আমার ব্রেন নিয়ে যাবে।" রাফি কিছু বলল না। শারমিন বলল, "কেন আমার ব্রেন নিয়ে যেতে চায়? কারা আমার ব্রেন নিয়ে যেতে চায়?"

"আমি জানি না, শারমিন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শারমিন নিচু গলায় বলল, "স্যার।"

"বলো।"

"আমার খুব ভয় করছে, স্যার।"

রাফির শারমিনের জন্য খুব মায়া হলো। সে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, "শোনো, শারমিন। আমি তোমার কাছে আছি। কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

"সত্যি, স্যার?"

আমার বই . কম

"হ্যাঁ, সত্যি।"

amarboi.com

এই প্রথমবার শারমিনের মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল। মেয়েটি রাফির কথা বিশ্বাস করেছে।

ইউনিভার্সিটির গেটে সাদা পাজেরোটি নিয়ে মানুষ দুটি অপেক্ষা করছিল। রাফি তাদের সামনে দিয়েই শারমিনকে নিয়ে বের হয়ে এল, মানুষ দুটি টেরও পেল না। টের পাওয়ার কথাও না। কারণ রাফি শারমিনের চুল ছোট করে ছেলেদের মতো করে কাটিয়েছে। একটা হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরিয়েছে, পায়ে সাদা টেনিস শু—তাকে দেখাচ্ছে ঠিক একজন বাচ্চা ছেলের মতো। রাফি সরাসরি রেলস্টেশনে চলে এসে ট্রেনের টিকিট কিনে ট্রেনে উঠেছে। আজ রাতেই সে ঢাকা পৌছাতে চায়। ঈশিতার ফোন পায়নি সত্যি, কিন্তু মাজু বাঙালি নামের একজন মানুষ তাকে ফোন করে বলেছে, সে তার সঙ্গে সামনাসামনি কথা বলতে চায়। রাফি তাই ঢাকা রওনা দিয়েছে। শারমিনকে রেখে যেতে সাহস পায়নি—তার বাবাও খুব ভয় পেয়েছে। নিজের কাছে রাখার চেয়ে শারমিনকে রাফির কাছে রাখাই তার বেশি

নিরাপদ মনে হয়েছে। শারমিন তাই রাফির সঙ্গে ঢাকা যাচ্ছে—তার নাম অবশ্যি এখন শারমিন নয়, আপাতত তাকে শামীম বলে ডাকা হচ্ছে।

গভীর রাতে শারমিন যখন রাফির ঘাড়ে মাথা রেখে ট্রেনের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঠিক তখন এনডেভারের ভেতর বব লাস্কি সাফারি কোট পরা মানুষ দুজনের সঙ্গে কথা বলছে। মানুষ দুজন হেলিকপ্টারে করে রাতের মধ্যেই ফিরে এসেছে। বব লাস্কি তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, "কী বললে? মেয়েটাকে তোমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল?"

মধ্য বয়স্ক মানুষটি মাথা নাড়ে। "হ্যাঁ, শুধু মেয়েটাকে না, আমার রিভলবারটাও।"

"তোমার রিভলবারটাও?"

"হ্যাঁ। ছাত্রগুলো ভয়ংকর বদ। কীভাবে খবর পেল, বুঝতে পারলাম না।"

বব লাস্কি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "কিন্তু তোমরা মেয়েটাকে না নিয়ে ফিরে এসেছ কেন?"

"মেয়েটা এখন সেখানে নেই।"

"তাহলে এখন কোথায়?"

"আমরা খোঁজ নিচ্ছি, পেয়ে যাব।"

"কেমন করে পাবে?"

"রাফি নামের ছেলেটাও নাই। নিশ্চয়ই দুজন একসঙ্গে আছে।"

"তোমাকে আমি চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিলাম।"

"চব্বিশ ঘণ্টা অনেক সময়। শুধু একটা ব্যাপার—"

"কী ব্যাপার?"

"এই চব্বিশ ঘণ্টা ঈশিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। রাফিকে ধরার জন্য তার সাহায্য লাগতে পারে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু মনে রেখো, চব্বিশ ঘণ্টার এক মিনিট বেশি নয়।"

ঈশিতা চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আয়ু পেয়ে গেল। একটা ছোট ঘরে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসে সে যখন রাত কাটাচ্ছিল, সে তার কিছুই জানতে পারল না।

আমার বই . কম
amarboi.com

৯.

বাসাটা খুঁজে বের করে বেল টেপার সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে গেল, মনে হলো দরজার ওপাশেই যেন মাজু বাঙালি রাফির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। রাফি শারমিনের হাত ধরে ভেতরে ঢোকে, ছোটখাটো একটা অ্যাপার্টমেন্ট, এখানে শুধু পুরুষ মানুষ থাকে, সেটি একনজর তাকালেই বোঝা যায়।

মাজু বাঙালি বলল, "আমার নাম মাজহার। আমি যখন কবিতা লিখি, তখন নাম লিখি মাজু বাঙালি।"

আমার বই . কম

"ইন্টারেস্টিং নাম। আমি রাফি আহমেদ। আমার সঙ্গে যে বাচ্চা ছেলেটা আছে, তার নাম হচ্ছে শামীম।"

"আহা, বেচারা! সারা রাত জার্নি করে কাহিল হয়ে গেছে।"

রাফি মাজহারের দিকে তাকাল, ঈশিতার ব্যাপার নিয়ে কথা বলার জন্য এসেছে, সে নিশ্চয়ই সবকিছু জানে। তাকে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করা যায়। তাকে শারমিনের পরিচয়টা দিয়ে রাখা ভালো। রাফি বলল, "ঈশিতা কি আপনাকে শারমিন নামের একটা মেয়ের কথা বলেছিল?"

"হ্যাঁ, বলেছিল। মানুষ কম্পিউটার। অসাধারণ জিনিয়াস।"

"হ্যাঁ। আমাদের শামীম আসলে সেই অসাধারণ জিনিয়াস মানুষ কম্পিউটার শারমিন। তার ওপর হামলা হচ্ছে, তাই তাকে ছেলে সাজিয়ে এনেছি। সুন্দর লম্বা চুল ছিল, আমি কেটে কেটে ছোট করেছি। চুল কাটা এত কঠিন, বুঝতে পারিনি।"

মাজহার ভালো করে শারমিনের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, "তুমিই তাহলে সেই মেয়ে?"

শারমিন কোনো কথা না বলে একটু মাথা নাড়ল। মাজহার বলল,

"তোমাকে দেখে খুব টায়ার্ড মনে হচ্ছে। তুমি বাথরুমে একটু হাত-মুখ ধুয়ে ওই সোফায় কয়েক মিনিট শুয়ে নাও। আমি রাফি সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলে একসঙ্গে নাশতা করব।"

শারমিন আবার মাথা নেড়ে ভেতরে গেল। মাজহার রাফির দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে তার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়। সে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমি জানি না, ঈশিতা মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি না।"

রাফি কিছু বলল না, কী বলবে বুঝতে পারছিল না। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার এখন নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। আমি যদি তাকে ভেতরে ঢোকার ব্যবস্থা না করে দিতাম, তাহলে এই সর্বনাশ হতো না।"

মাজহার বলল, "হতো। অন্য কোনোভাবে হতো। মেয়েটাকে আমি খুব কম সময়ের জন্য দেখেছি, কিন্তু যেটুকু দেখেছি, তাতেই বুঝতে পেরেছি, এর জীবনটাই হচ্ছে বিপজ্জনক। আপনি নিজেকে অপরাধী ভাববেন না। আমি লিখে দিতে পারি, সে নিজেই ভেতরে ঢুকতে চেয়েছে, আপনি তাকে নিষেধ করেছেন।"

"সেটা সত্যি।"

দুজনে সোফায় গিয়ে বসে এবং কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। কী বলবে, সেটা যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। মাজহার হঠাৎ সোজা হয়ে বসে বলল, "আমি পুরো ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখেছি। আপনার সঙ্গে একটু শেয়ার করি। ঈশিতা ইজ রাইট—এনডেভার শুধু যে এ দেশে এফটি টোয়েন্টি সিক্স ভাইরাস ছড়িয়েছে তা নয়, তারা চিকিৎসার নাম করে অসুস্থ মানুষগুলোর ব্রেন নিজেদের কাজে ব্যবহার করেছে। আমরা সেটা জানি কিন্তু সেটা নিয়ে থানা পুলিশ করতে পারছি না। আপনি তাদের সিস্টেমে ঢুকেছেন, নিজের চোখে দেখেছেন কিন্তু সেই কথাটা কাউকে বলা যাচ্ছে না, কারণ আপনি ঢুকেছেন বেআইনিভাবে। আপনার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, উল্টো আপনি বিপদে পড়ে যাবেন। শারমিন বিপদে পড়ে যাবে। তা ছাড়া এ দেশে এনডেভারের অনেক সুনাম, মিডিয়া এনডেভারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাদের সম্পর্কে একটা খারাপ কথা কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না। এনডেভার ভয়ংকর অন্যায় করতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমরা ছোটখাটো বেআইনি কাজও করতে পারব না।"

মাজহার রাফির দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, রাফি কী ভাবছে। রাফি বলল, "আমরা যেটা করেছি, তাদের পাসওয়ার্ড ভেঙে সিস্টেমে

ঢুকেছি, সেটা বেআইনি হতে পারে, কিন্তু পুরো বিষয়টা সবাই জানতে পারলে সেটাকে কেউ অনৈতিক বলবে না। পৃথিবীতে অনেকবার এ রকম হয়েছে, কোনো একজন সাংবাদিক একটা অনেক বড় অন্যায়-অবিচার প্রকাশ করে দিয়েছে। সে জন্য জেলও খেটেছে, কিন্তু সারা জীবন মাথা উঁচু করে থেকেছে।"

"কিন্তু আমাদের সময় খুব কম। ঈশিতাকে এর মাঝে মেরে ফেলেছে কি না, আমি জানি না। যদি মেরে ফেলে না থাকে তাহলে যেভাবে হোক ভেতরে পুলিশ-র‍্যাব-সাংবাদিক পাঠাতে হবে।

"কীভাবে পাঠাবেন?"

"আমি ওদের বিল্ডিংয়ে বিশাল একটা বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই।"

"বিস্ফোরণ? বিল্ডিংয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

"ওদের বিল্ডিংয়ের অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব আমার। আজকে ওখানে সাপ্লাই নিয়ে যাব। ওদের যে রুমে কোনো মানুষ থাকে না, শুধু যন্ত্রপাতি, সেসব রুমে আমি অক্সিজেন লিক করিয়ে দেব।"

রাফি মাজহারকে বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু অক্সিজেন দিয়ে তো বিস্ফোরণ হয় না। সেটা জ্বলতে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু বিস্ফোরণের জন্য এক্সপ্লোসিভ কিছু দরকার—"

মাজহার মাথা নাড়ল। বলল, "হ্যাঁ, সে জন্য আমি অক্সিজেন লেখা সিলিন্ডারে করে মিথেনও নিয়ে যাব। ঘরের ভেতরে একেবারে সঠিক অনুপাতে মিথেন অক্সিজেন লিক করিয়ে দেব।"

"তার পরেও তো একটা স্পার্ক দরকার—"

"আমি যেসব ঘরে লিক করাব, সেখানে ভারী ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি রয়েছে, বন্ধ হচ্ছে, চালু হচ্ছে, সেখানে স্পার্ক কোনো ব্যাপার নয়। আমি যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাই নিয়ে কাজ করি, আমাকে সবার আগে শেখানো হয়েছে নিরাপত্তা। সেফটি। আমি নিরাপত্তার যা যা শিখেছি, তার সব কটি আজকে ভায়োলেট করাব।"

রাফি মাথা নাড়ল, "আপনি মনে হচ্ছে পুরোটা চিন্তা করে দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, করেছি। কিন্তু আমার মনে হলো, আরও একজনের সঙ্গে পুরো ব্যাপারটা একটু শেয়ার করা দরকার। সে জন্য আপনাকে ডেকেছি।"

"থ্যাংকু।"

"আপনার যদি কোনো আইডিয়া থাকে, বলেন।"

রাফি কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, "না, এই মুহূর্তে আমার কোনো আইডিয়া নেই। শুধু একটি ব্যাপার—"

"কী?"

"আমরা সব সময়ই বলছি, এনডেভার এ দেশের পুলিশ-র‍্যাব—সবাইকে কিনে রেখেছে। কিন্তু এটা তো হতে পারে না যে এখানে কোনো ভালো মানুষ, সৎ মানুষ নেই। যাকে কেনা সম্ভব না।"

"নিশ্চয়ই আছে। সব জায়গায় থাকে। সেই জন্যই দেশটি চলছে।"

"কাজেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত। আমি তাই ভাবছি, আমি শারমিনকে নিয়ে যাব। চেষ্টা করব, একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাথে দেখা করার জন্য। যদি দেখা করতে পারি, তাহলে চেষ্টা করব তাকে বোঝাতে। যদি বোঝাতে না-ও পারি, তাহলে অন্তত একটা জিডি করিয়ে আসব।"

"গুড আইডিয়া।" মাজহার মাথা নাড়ল।

"আপনার এখান থেকে বের হয়েই আমি থানায় চলে যাব।"

"ঠিক আছে।" মাজহার বলল, "এখন আপনি বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসেন। নাশতা করি।"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি আর শারমিন যখন মাজহারের বাসায় নাশতা করছিল, ঠিক তখন ঈশিতার ছোট ঘরটি খুলে একজন মানুষ তার জন্য নাশতা নিয়ে আসে। তাকে সারা রাত যে ঘরে আটকে রেখেছে, সেই ঘরটি ছোট এবং আধুনিক, সঙ্গে খুব ছোট এবং অসম্ভব পরিষ্কার একটি বাথরুমও আছে কিন্তু আর কিছু নেই। সে ঘরের কোনায় বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় রাত কাটিয়েছে।

মানুষটা নাশতার ট্রে-টি মেঝেতে রেখে কোনো কথা না বলে দরজা খুলে বের হয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজায় আবার তালা মেরে দিয়েছে, সে তার শব্দটাও ভেতরে বসে শুনতে পেল। নাশতার জন্য তাকে যে খাবারগুলো দিয়েছে, সেগুলো খুব চমৎকার করে সাজানো। এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস। দুই স্লাইস রুটি, মাখন, জেলি, ডিম পোচ, কলা, আপেল, এক গ্লাস দুধ আর পানির বোতল। ঈশিতা সকালে নাশতা করতে পারে না—অনেক দিন সে শুধু একটা টোস্ট বিস্কুট কিংবা একমুঠো মুড়ি খেয়ে দিন শুরু করে। ঈশিতা

ভেবেছিল, সে নাশতা করতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল, তার বেশ খিদে পেয়েছে এবং সে বেশ তৃপ্তি করেই নাশতা করল। খাওয়া শেষ তার, চায়ের তৃষ্ণা হলো কিন্তু কথাটি সে কাউকে বলতে পারল না। ছোট আধুনিক একটা ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকে।

এ রকম সময়ে খুট করে দরজা খুলে গেল, আগের মানুষটি একটা ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। ট্রের ওপরে একটা ছোট পট। একটা সুন্দর পোর্সেলিনের কাপ, একটা পিরিচে টি-ব্যাগ, চিনির প্যাকেট এবং একটা দুধদানিতে দুধ। মানুষটি ট্রে-টি মেঝেতে রেখে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তার গলা থেকে একটা ব্যাগ ঝুলছে, ব্যাগটা মেঝেতে রেখে সে বাথরুমে ঢুকে যায় এবং অনেক রকম শব্দ করে বাথরুম ধোয়া শুরু করে দেয়।

একটু পর বাথরুম থেকে বের হয়ে তার নাশতার ট্রে-টি নিয়ে কোমর থেকে ঝোলানো চাবি দিয়ে তালা খুলে ঘর থেকে বের হয়ে যায়। ঈশিতা আবার শুনতে পেল, বাইরে থেকে তালা দেওয়া হয়েছে। ঈশিতা একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলল এবং হঠাৎ করে লক্ষ করল, মানুষটি তার ব্যাগটা ভুল করে ফেলে গেছে। সে ব্যাগটা টেনে এনে খোলে, ভেতরে একটা সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, কিছু কাগজপত্র, খুচরা টাকা এবং একটা সস্তা মোবাইল টেলিফোন। ঈশিতা কাঁপা হাতে মোবাইল টেলিফোনটা নেয়, বাইরে কাউকে ফোন করার এ রকম একটা সুযোগ পেয়ে যাবে, সে কল্পনাও করতে পারেনি। কাকে ফোন করতে পারে? তার পত্রিকার সম্পাদক নুরুল ইসলামকে, নাকি তার হোস্টেলের রুমমেটকে? নাকি রাফিকে? কিংবা মাজু বাঙালিকে? ঈশিতা আবিষ্কার করল যে কারও টেলিফোন নম্বরই তার মুখস্থ নেই। রাফিকে নানা টেলিফোন থেকে অনেকবার ফোন করেছে বলে আবছা আবছাভাবে তার নম্বরটা একটু বেশি মনে আছে। ঈশিতা কাঁপা হাতে নম্বরটা ডায়াল করল।

ঠিক সেই সময় রাফি মাজহারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শারমিনের হাত ধরে বের হয়ে এসেছে। বাইরে ঢাকা শহরের অবাস্তব ভিড়। মানুষজন অফিসে যাওয়ার জন্য বের হয়েছে, তাদের ব্যস্ত ছোটাছুটি দেখে মনে হচ্ছে তারা কেউ বুঝি মানুষ নয়, সবাই যেন একটা খাঁচায় আটকে থাকা ইঁদুরের বাচ্চা। মনে হচ্ছে, হঠাৎ বুঝি কেউ খাঁচাটা খুলে দিয়েছে এবং ইঁদুরের বাচ্চাগুলো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি করছে। রাফি রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে একটা হলুদ রঙের ক্যাবকে থামাতে

আমারবই.কম
amarboi.com

পারল। ক্যাবের ভেতর উঠে রাফি আর শারমিন মাত্র বসেছে, ঠিক তখন তার টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনে অপরিচিত একটা নম্বর।

রাফি টেলিফোনটা ধরে বলল, "হ্যালো।"

সে শুনল অপর পাশ থেকে ঈশিতা বলছে, "রাফি, আমি ঈশিতা।"

রাফি সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে, "ঈশিতা? তুমি? কোথায়?"

"আমি এনডেভারের ভেতর। আমাকে ধরে ফেলেছে।"

"ধরে ফেলেছে?"

"হ্যাঁ, আমি খুব বিপদের মাঝে আছি।"

"তুমি তাহলে টেলিফোনে কীভাবে কথা বলছ?"

ঈশিতা বলল, "একজন মানুষ ভুল করে তার ব্যাগটা আমার ঘরে ফেলে গেছে। ভেতরে এই টেলিফোনটা ছিল। মানুষটি কখন টের পেয়ে যাবে, জানি না। টের পেলেই ফোনটা নিয়ে নেবে। আমি তাড়াতাড়ি কয়েকটা কথা বলি।"

ঈশিতা তাড়াতাড়ি কথা বলতে থাকে, যদিও সে জানত না যে তার তাড়াতাড়ি কথা বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না। ব্যাগটা মোটেও ভুল করে ফেলে যাওয়া হয়নি, ইচ্ছে করে রেখে যাওয়া হয়েছে। সস্তা টেলিফোনটা আসলে মোটেও সস্তা টেলিফোন নয়, এটি সরাসরি স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। ঈশিতা যখন রাফির সঙ্গে কথা বলছিল, তখন সেই কথা বলার সিগনালটা ট্র্যাক করে রাফিকে খুঁজে বের করা হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাফির ইয়েলো ক্যাবটাকে ট্র্যাক করা হলো এবং তখন একাধিক স্যাটেলাইট থেকে সেটাকে চোখে চোখে রাখা শুরু হয়ে গেল। শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাখা এনডেভারের সিকিউরিটি গাড়িগুলোকে সেই খবর পৌঁছে দেওয়া হলো এবং তারা রাফির ইয়েলো ক্যাবটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

ঈশিতার সঙ্গে কথা বলে রাফি যখন টেলিফোনটা রেখেছে, তখন আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল, রাফি দেখল, সুহানা ফোন করেছে। সে ফোনটা কানে লাগিয়ে বলল, "হ্যালো, সুহানা।"

সুহানা অন্য পাশ থেকে রীতিমতো চিৎকার করে উঠল, "কী হলো, রাফি? তুমি কোথায়? নয়টার সময় তোমার ক্লাস, এখন বাজে নয়টা পনেরো। তোমার ছাত্রছাত্রীরা পাগলের মতো তোমাকে খুঁজছে। বিশেষ করে তোমার ছাত্রীরা। তোমাকে পনেরো মিনিট দেখতে পায়নি, তাতেই তাদের হার্ট বিট মিস হতে শুরু করেছে।"

রাফি বলল, "সুহানা। শোনো। আমি অসম্ভব বড় একটা ঝামেলার মাঝে পড়েছি।"

সুহানা সাথে সাথে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ে, "কী হয়েছে, রাফি?"

"আমি এখন ঢাকায়। একটা ইয়েলো ক্যাবে থানাতে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে আছে শারমিন। থানাওয়ালারা আমার কথা শুনবে কি না, আমি বুঝতে পারছি না—"

রাফি তার কথা শেষ করার আগেই পেছন থেকে একটা বড় গাড়ি তার ক্যাবে ধাক্কা দিল, সাথে সাথে ঠিক সামনে একটা গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে গেল। কিছু বোঝার আগেই পাশে আরও একটা গাড়ি থেমে যায়, সেখান থেকে কয়েকজন মানুষ নেমে এসে ক্যাবের দরজা খুলে রাফি আর শারমিনকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বের করে আনে। তারা কিছু বোঝার আগেই তাদের একটা ফোর হুইল ড্রাইভ জিপে তুলে নেওয়া হয় এবং সেটা টায়ারে কর্কশ শব্দ তুলে সামনে এগিয়ে যায়, ব্যস্ত রাস্তায় সেটা ইউ টার্ন নিয়ে উল্টোদিকে ছুটতে থাকে।

রাফি হতবাক হয়ে গাড়ির ভেতর তাকাল, পেছনের সিটে সাফারি কোট পরা দুজন মানুষ বসে আছে। একজনের হাতে একটা বেঢপ রিভলবার, সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তোমার ছাত্ররা আমার নিজের রিভলবারটা ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। এরা কী রকম ছাত্র, আর্মস ছিনতাই করে?"

রাফি কোনো কথা না বলে মানুষটির চেহারা ভালো করে দেখার চেষ্টা করে। মাঝবয়সী নিষ্ঠুর চেহারার মানুষ। মানুষটি হাতের রিভলবারটা শারমিনের মাথায় ছুঁইয়ে বলল, "চুল ছোট করে কাটলেই মেয়ে কি ছেলে হয়ে যায়?"

রাফি কোনো কথা না বলে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। মানুষটি বলল, "এই মেয়েটার মগজ নাকি মিলিয়ন ডলার কেজিতে বিক্রি হবে। ইচ্ছে করছে, গুলি করে খুলি ফুটো করে সেই মগজটা দেখি—মিলিয়ন ডলারের মগজ দেখতে কী রকম!"

খুব উঁচুদরের রসিকতা করেছে, সে রকম ভঙ্গি করে মানুষটি হা হা করে হাসতে থাকে। রসিকতাটা নিশ্চয়ই উঁচুদরের হয়নি, গাড়ির আর কেউ তার হাসির সঙ্গে যোগ দিল না। মানুষটি সে কারণে একটু মনঃক্ষুণ্ন হলো বলে মনে হলো। মুখটা শক্ত করে বলল, "শোনো, মাস্টার সাহেব আর তোমার ছাত্রী, এই গাড়ির ভেতরে তোমরা টুঁ শব্দ করবে না। গাড়ির কাচ কালো

রঙের, বাইরের কেউ তোমাদের দেখবে না। গাড়ি সাউন্ডপ্রুফ, চেঁচিয়ে গলা ভেঙে ফেললেও কেউ শুনতে পারবে না। তার পরও যদি বাড়াবাড়ি করো, আমি দুজনকে অজ্ঞান করে রাখব। অনেক আধুনিক উপায় আছে, আমি সেসবে যাব না, রিভলবারের বাঁট দিয়ে মাথার পেছনে শক্ত করে মারব—অনেক পুরোনো পদ্ধতি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস কাজ করে।"

রাফি বুঝতে পারল, মানুষটি তার সঙ্গে ঠাট্টা করছে না। কাজেই সে চুপ করে বসে রইল। কিছুক্ষণ আগেই সে ঈশিতার জন্য দুশ্চিন্তা করছিল, এখন সে নিজে ঠিক ঈশিতার জায়গায় এসে পড়েছে। তার জন্য এখন কে দুশ্চিন্তা করবে? কেউ কি আছে দুশ্চিন্তা করার?

রাফির জন্য কেউই দুশ্চিন্তা করছিল না, সেটি অবশ্য সত্যি নয়। সুহানা যখন রাফির সাথে কথা বলছিল, তখন ঠিক কথার মাঝখানে সে শুনতে পেল একটা বিকট শব্দ এবং তারপর কিছু উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। হঠাৎ করে টেলিফোনটা নীরব হয়ে গেল—আর কিছু বুঝতে না পারলেও অস্বাভাবিক কিছু একটা ঘটেছে, সেটা বুঝতে সুহানার অসুবিধা হলো না।

সে রাফির ক্লাসে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দিয়ে দিল, তারপর সে অন্যদের খোঁজাখুঁজি করল। কাউকে না পেয়ে সে গেল নেটওয়ার্কিং ল্যাবে। রাফি আর শারমিনকে সেদিন এখানে একটা কম্পিউটারে বসে কিছু কাজ করতে দেখেছে—তারা কী কাজ করছিল, সেটা একটু বুঝতে চায়।

প্রফেসর হাসান এলে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে, স্যার অনেক মানুষকে চেনেন, পুলিশকে হয়তো খবর দিতে পারবেন। তাদের কথাকে কেউ গুরুত্ব দেবে না, প্রফেসর হাসানকে নিশ্চয়ই গুরুত্ব দেবে।

আমারবই.কম
amarboi.com

১০.

ঘরটিতে ঢুকে ঈশিতা হতভম্ব হয়ে গেল। গতকাল কালো টেবিলটার যে মাথায় সে বসেছিল, আজকে সেখানে বসে আছে রাফি ও শারমিন। শারমিনের চুল ছেলেদের মতো করে কাটা, কিন্তু সে জন্য তাকে চিনতে কোনো সমস্যা হলো না। সে তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না—মাত্র কিছুক্ষণ আগে সে রাফির সঙ্গে কথা বলেছে। ঈশিতা কয়েকবার চেষ্টা করে বলল, "রাফি, তুমি?"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি দুর্বলভাবে হাসার চেষ্টা করল। বলল, "হ্যাঁ।"

"কেমন করে?"

রাফি কিছু বলার আগে সাফারি কোট পরা চুল ছোট করে ছাঁটা মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "তুমি যখন তার সঙ্গে পিরিতের কথা বলছিলে, তখন তাকে ট্র্যাক করেছি। এ জন্য যখন-তখন পিরিতের কথা বলতে হয় না।" মানুষটি হা হা করে আনন্দে হাসতে থাকে। তার কথা বলার অশালীন ভঙ্গিটি পুরোপুরি উপেক্ষা করে ঈশিতা রাফির কাছে গিয়ে বলল, "তোমাকেও ধরে এনেছে? কী সর্বনাশ!"

রাফি জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "হ্যাঁ, খুব ঝামেলার মাঝে পড়ে গেলাম মনে হচ্ছে।"

টেবিলের অন্য পাশে বব লাস্কি বসেছিল, সে ইংরেজিতে বলল, "বস। কোনো রকম পাগলামি করার চেষ্টা করো না। তার কারণ, তোমাদের পেছনে যে দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, তারা আর্মড। কিন্তু তাদের আর্মড থাকার প্রয়োজন নেই, তারা খালি হাতেই দু-চারটা মানুষ খুন করতে পারে।"

রাফি পেছনে তাকাল, নিঃশব্দে তার পেছনে একজন সাদা এবং একজন কুচকুচে কালো মানুষ কখন এসে দাঁড়িয়েছে, সে লক্ষ করেনি। শারমিন রাফির হাত ধরে ভয় পাওয়া গলায় বলল, "এই মানুষটা কী বলছে?"

রাফি বলল, "আমাদের চুপ করে বসে থাকতে বলেছে।"

"মানুষটা এখন আমাদের কী করবে?"

"আমি জানি না। দেখি, কী করে।"

বব লাস্কি বলল, "তোমাদের সঙ্গে যে বাচ্চাটা বসে আছে, সেই কি অসাধারণ প্রতিভাধর বাচ্চা, যে আমাদের এনক্রিপটেড কোড ভেঙেছে?"

রাফি কিংবা ঈশিতা কেউই কথার উত্তর দিল না। বব লাস্কি একটু কঠিন গলায় বলল, "আমার কথার উত্তর দাও।"

রাফি বলল, "তার আগে আমি কি তোমাকে এক-দুটি প্রশ্ন করতে পারি?"

"কী প্রশ্ন?"

"আমাদের এভাবে ধরে আনার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?"

বব লাস্কি শব্দ করে হেসে ওঠে, "তোমার ধারণা, আমার সে জন্য কারও কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে?"

রাফি কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, "আমাদের তোমরা কী জন্য ধরে এনেছ?"

আমার বই.কম
amarboi.com

বব লাস্কি বলল, "বোকার মতো কথা বলো না। তোমরা খুব ভালো করে জানো, তোমাদের কী জন্য ধরে এনেছি। ধানাই-পানাই না করে সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এসো।"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কাজের কথাটি কী?"

বব লাস্কি হাত তুলে শারমিনকে দেখিয়ে বলল, "এই মেয়েটাই কি সেই মেয়ে? শারমিন?"

চুল ছোট করে ছাঁটা সাফারি কোট পরা মধ্যবয়স্ক মানুষটি বলল, "হ্যাঁ, বস। এইটাই সেই মেয়ে। আমি জানি।"

বব লাস্কি বলল, "তুমি কেমন করে জানো?"

"আমি যখন তাকে ধরে আনছিলাম, ইউনিভার্সিটির কিছু বখা ছেলে ছিনিয়ে নিল।"

বব লাস্কি চোখ লাল করে বলল, "তোমার বলতে লজ্জা করে না যে ইউনিভার্সিটির কিছু বখা ছেলে তোমার হাত থেকে বাচ্চা একটা মেয়েকে ছিনিয়ে নিল? তুমি এই ঘর থেকে বের হয়ে যাও। আর আমি না ডাকলে তুমি কখনো এই ঘরে ঢুকবে না।"

সাফারি কোট পরা চুল ছোট করে ছাঁটা মানুষটির মুখ অপমানে কালো হয়ে উঠল। ঈশিতা মানুষটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আশা করছি, এই ধরনের অপমান সহ্য করার জন্য এরা তোমাকে যথেষ্ট টাকা দেয়।"

মানুষটা কোনো উত্তর না দিয়ে গটগট করে বের হয়ে গেল। বব লাস্কি গজগজ করে বলল, "এই পোড়া দেশে বিশ্বাসযোগ্য কাজের মানুষের এত অভাব!"

রাফি বলল, "তোমার তো কাজের মানুষ দরকার নেই, তোমার দরকার ঘাঘু ক্রিমিনাল, নিজের দেশ থেকে নিয়ে এলে না কেন?"

বব লাস্কি রক্তচক্ষু করে রাফির দিকে তাকাল, কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। শারমিন রাফির হাত ধরে ফিসফিস করে জানতে চাইল, "এই মানুষটা এখন কী নিয়ে কথা বলছে?"

"তোমাকে নিয়ে। জানতে চাইছে, তুমি কি সেই মেয়েটা নাকি, যে সবকিছু করতে পারে।"

"কেন জানতে চাইছে?"

"এখনো বুঝতে পারছি না।"

বব লাস্কি তার সামনে রাখা ছোট খেলনার মতো কম্পিউটারটির কি-বোর্ডে চাপ দিয়ে সেখানে নিচু গলায় কিছু একটা বলল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ভেতর বেশ কয়েকজন মানুষ এসে ঢুকল। ঈশিতা মানুষগুলোকে চিনতে পারে। গতকাল তাদের সবার সঙ্গে দেখা হয়েছে। শারমিন একটু অবাক হয়ে বিদেশি মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আগে কখনো মানুষ দেখেনি। মানুষগুলো কালো টেবিলের দুই পাশে এসে বসে। বব লাস্কি তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমরা যে মেয়েটিকে খুঁজছিলে, এটি সেই মেয়ে।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "দেখে মনে হচ্ছে, একজন ছেলে।"

বব লাস্কি বলল, "কেউ যেন চিনতে না পারে, সে জন্য তাকে এভাবে সাজিয়েছে।"

"হাউ ইন্টারেস্টিং!"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আমরা মেয়েটিকে একটু পরীক্ষা করতে চাই।"

"করো।"

মানুষটা শারমিনের দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে বলল, "তুমি কি ইংরেজি জানো?"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি শারমিনের হয়ে বলল, "না, জানে না।"

নীল চোখের মানুষটি তার ল্যাপটপের ক্যালকুলেটরে কিছু একটা হিসাব করে বলল, "তুমি তাকে জিজ্ঞেস করো, বারো মিলিয়ন আট শ নয় হাজার দুই শ একচল্লিশের বর্গমূল কত?"

শারমিন জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কী করতে বলেছে?"

"একটা সংখ্যা বলে তার বর্গমূল জানতে চাইছে।"

"সংখ্যাটা বুঝতে পেরেছি। বর্গমূল মানে কী?"

"কোনো সংখ্যাকে সেই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে এটা পাবে।"

"তিন হাজার পাঁচ শ ঊনআশি।"

রাফি সংখ্যাটি বলল এবং সব বিদেশি মানুষ তখন তাদের জায়গায় নড়েচড়ে বসল। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি ল্যাপটপে কিছু একটা লিখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে শারমিনকে জিজ্ঞেস করল, "চৌত্রিশ হাজার সাত শ একানব্বইকে ছাপ্পান্ন হাজার নয় শ বত্রিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?"

শারমিন বলল, "এক বিলিয়ন, নয় শ আশি মিলিয়ন সাত শ একুশ হাজার দুই শ বারো।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে বলল, "এটাই সেই মেয়ে। আমাদের কোনো সন্দেহ নেই।"

বব লাস্কি জানতে চাইল, "এখন কী করতে চাও?"

"অনেক কিছু। প্রথমে ওর ব্রেনের থ্রি ডি একটা স্ক্যান করতে চাই। তারপর ইমেজিং। সবার শেষে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে ইন্টারফেসিং।"

"গুড। শুরু করে দাও।"

মানুষগুলো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমরা তাহলে মেয়েটিকে নিয়ে যাই।"

"যাও।"

রাফি চমকে উঠে বলল, "কোথায় নিয়ে যাবে?"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আমরা তোমার কথার উত্তর দিতে বাধ্য নই। আমাদের ঝামেলা কোরো না।"

রাফি শারমিনকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, "না। আমি শারমিনকে নিতে দেব না।"

"সরে যাও।"

রাফি হিংস্র স্বরে বলল, "তোমরা সরে যাও।"

মানুষটা একপাশে এসে শারমিনের হাত ধরে বলল, "ছেড়ে দাও।"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি বুকে ধাক্কা দিয়ে মানুষটিকে সরিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি ছেড়ে দাও।"

রাফির ধাক্কা খেয়ে মানুষটি পড়তে পড়তে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে অবাক হয়ে রাফির দিকে তাকাল, তারপর হিস হিস করে বলল, "তুমি অনুমানও করতে পারছ না, তুমি কোথায় আছ। তোমার একটা দ্রুত যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর ব্যবস্থা করতে পারতাম, এখন মনে হচ্ছে, তার প্রয়োজন নেই।"

বব লাস্কি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বাচ্চাদের মতো হাতাহাতি করার কোনো প্রয়োজন নেই। সরে দাঁড়াও। আমাদের ফাইভ ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট তোমাদের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।" সে একটু ইঙ্গিত করতেই কুচকুচে কালো মানুষটি রাফির দিকে এগিয়ে আসে এবং কিছু বোঝার আগেই রাফি অনুভব করল, কেউ একজন তার ঘাড়ে আঘাত করেছে, মুহূর্তে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। ঈশিতা রাফিকে ধরার চেষ্টা করল, ভালো করে ধরতে পারল না। রাফি টেবিলের কোনায় ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে গেল। ঈশিতা চিলের মতো চিৎকার করে রাফিকে ধরল, মাথা কেটে রক্ত বের হচ্ছে। প্রথমে হাত দিয়ে, তারপর নিজের কাপড় দিয়ে রক্ত থামানোর চেষ্টা করল।

আমার বই. কম
amarboi.com

নীল চোখের মানুষটি খপ করে শারমিনের হাত ধরে তাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিতে থাকে। শারমিন ভয় পেয়ে চিৎকার করে বলল, "যাব না। আমি যাব না।" কেউ তার কথায় ভ্রুক্ষেপ করল না। শারমিন কোনোভাবে চেষ্টা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ঈশিতার দিকে ছুটে আসে। ঈশিতা উঠে দাঁড়িয়ে শারমিনকে ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু দুই দিক থেকে তখন দুজন মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে। পাহাড়ের মতো কালো মানুষটি ঈশিতাকে ধরে বলল, "তুমি আর একটু নড়েছ কি তোমার অবস্থা হবে তোমার বন্ধুর মতন।"

ঈশিতা নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল, পারল না। যে মানুষটি তাকে ধরেছে, তার গায়ের জোর মোষের মতন, আঙুলগুলো লোহার মতো শক্ত। বেশ কয়েকজন মিলে শারমিনকে ধরেছে, সে চিৎকার করে কাঁদছে। সেই অবস্থায় তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেতে থাকে। ঈশিতা শারমিনের দিকে তাকিয়ে ছটফট করতে থাকে। ক্রোধ, ভয়ংকর-ক্রোধ তার ভেতরে পাক খেতে থাকে। অসহায় ক্রোধের মতো যন্ত্রণা বুঝি আর কোথাও নেই। সে বব লাস্কির দিকে তাকিয়ে হিংস্র গলায় চিৎকার করে বলল, "তোমাকে এর মূল্য দিতে হবে।"

বব লাস্কি সহৃদয় ভঙ্গিতে হেসে বলল, "তুমি ছোট একটা ভুল করেছ, মেয়ে। আমাকে মূল্য দিতে হবে না, আমাকেই মূল্য দেওয়া হবে। এটা দেখার জন্য তুমি থাকবে না, সেটাই হচ্ছে দুঃখ।"

রাফির মনে হলো, অনেক দূর থেকে কেউ তাকে ডাকছে, "রাফি, এই রাফি" ঘুমের মধ্যে তার মনে হলো মানুষটিকে সে চেনে। কিন্তু কে, ঠিক বুঝতে পারছে না। মানুষটি আবার ডাকল, "এই রাফি, চোখ খুলে তাকাও—"

গলার স্বরটি একটি মেয়ের। রাফি চোখ খুলে তাকাল, ঠিক তার মুখের ওপর ঈশিতা ঝুঁকে আছে, তার চোখেমুখে ভয়ের ছাপ। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ, রাফি?"

রাফি তখনো পরিষ্কার করে চিন্তা করতে পারছে না, আবছা আবছাভাবে তার সবকিছু মনে পড়তে থাকে এবং হঠাৎ করে তার সবকিছু মনে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে বসতে গিয়ে আবিষ্কার করল, মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। সে মাথায় হাত দিতেই অনুভব করে, সেখানে চটচটে রক্ত। রাফি ঈশিতার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা কোথায়?"

"একটা ঘরে। কাল রাত আমাকে এই ঘরে আটকে রেখেছিল।"

আমার বই : কম
amarboi.com

"শারমিন?"

"জানি না। সবাই মিলে ধরে নিয়ে গেছে।"

রাফি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার জন্য এই বাচ্চা মেয়েটার এত বড় সর্বনাশ হলো।"

ঈশিতা বলল, "কেন, তোমার জন্য কেন?"

"আমি যদি বের না করতাম যে শারমিন একটা প্রডিজি, যদি তার ডিসলেক্সিয়ার একটা সমাধান বের করে না দিতাম, তাহলে তো সে এখনো বেঁচে থাকত। তাহলে কেউ তার মাথা কেটে ব্রেন বের করে নিতে পারত না।"

"সেটি তো তোমার দোষ নয়। এই পৃথিবীতে যে দানবেরা আছে, সেটা কী তোমার দোষ?"

রাফি কোনো কথা বলল না। ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "এখন আমরা কী করব?"

রাফি বলল, "আমাদের শেষ ভরসা মাজু বাঙালি।"

"মাজু বাঙালি কী করবে?"

"এই ঘরের ভেতর নিশ্চয়ই তিরিশটা টেলিভিশন ক্যামেরা আমাদের দিকে মুখ করে রেখে দেখছে, আমরা কী করি। আমরা কী বলি। কাজেই আমি এখন কিছু বলব না।"

"ঠিক আছে।"

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকে। রাফি হঠাৎ ছটফট করে উঠে বলল, "আমি আর পারছি না। কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব একটা ব্যাপার।"

ঈশিতা মাথা নাড়ল। বলল, "আমি জানি, এর চেয়ে বেশি কষ্ট আর কিছুতে না। কাল সারাটা রাত আমার এভাবে কেটেছে। কিন্তু করবে কী? এটুকুন একটা ঘরে তুমি কী করবে?"

রাফি বলল, "জানি না। কিন্তু দেখি।" সে উঠে দাঁড়াল, সাথে সাথে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা করে ওঠে। সে দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথার ধাক্কাটা সহ্য করে। ব্যথাটা একটু কমার পর সে ঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। একটা দরজা ছাড়া এখানে ঢোকার কিংবা বের হওয়ার অন্য কোনো পথ নেই। ছোট একটা বাথরুম, সেখানে একটা সিংক আর টয়লেট, আর কিছু নেই। রাফি ওপরে তাকাল, ঘরের ভেতরে আলোগুলো আসছে ফলস সিলিংয়ের ভেতর থেকে। লাইট বাল্ব দেখা যাচ্ছে না—শুধু নরম একটা আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। নিশ্ছিদ্র একটা ঘর, দরজা কিংবা দেয়াল না ভেঙে এখান থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নেই।

আমারবই.কম
amarboi.com

এ রকম সময় দরজায় শব্দ হলো, খুট করে একটা শব্দ হলো এবং খাবারের ট্রে হাতে একজন মানুষ এসে ঢুকল। সকালে যে মানুষটি এসেছিল, এটি সেই মানুষ নয়। অন্য একজন, অন্য মানুষটির মতোই এর ভাবলেশহীন মুখ। ঘরে যে দুজন মানুষ আছে, সেটি যেন সে লক্ষও করছে না। ট্রে দুটি মেঝেতে রেখে সে যন্ত্রের মতো পুরো ঘরটি একবার দেখে, বাথরুমে যায়, অকারণে ট্যাপ খুলে দেখে এবং টয়লেট ফ্লাশ করে তারপর ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

রাফি খাবারগুলো দেখে বলল, "এগুলো খেতে হবে? আমাদের কি এখন খাওয়ার মুড আছে?"

"নেই। কিন্তু তুমি অবাক হয়ে যাবে যে তুমি তার পরও কী পরিমাণ খেতে পারবে। এ রকম অবস্থায় যখন শরীরের কিছু একটা হয়, তখন প্রচণ্ড খিদে পায়।"

রাফি অবাক হয়ে দেখল, সত্যি সত্যি তার খিদে পেয়েছে এবং গোগ্রাসে সে সবকিছু খেয়ে শেষ করে ফেলল। নিজেরটা শেষ করে সে ঈশিতার আপেলটা

খেতে খেতে গলা নামিয়ে শোনা যায় না, এভাবে ফিসফিস করে বলল, "একটু পর লোকটা খালি ট্রে নিতে আসবে না?"

"হ্যাঁ।"

"তখন দুজন মিলে লোকটাকে অ্যাটাক করলে কেমন হয়?"

ঈশিতা এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বলল, "চমৎকার হয়। ওরা এমনিতেই আমাদের মেরে ফেলবে, ভালো মানুষ হয়ে লাভ নেই।"

"গুড।"

"কী দিয়ে অ্যাটাক করবে?"

"এই ট্রে দুটি মোটামুটি ভারী। একসঙ্গে নিয়ে মাথায় বাড়ি দিতে পারি।"

"চিনামাটির প্লেট, পিরিচ, থালা এগুলোও ভেঙে টুকরো টুকরো একটা ব্যাগে ভরে মাথায় বাড়ি দিতে পারি—"

"ব্যাগ?" রাফি বলল, "ব্যাগ কোথায় পাবে?"

"আমার এই ওড়নাটা দিয়ে বেঁধে নিতে পারি।"

"ভেরি গুড। তাহলে কাজ শুরু করে দিই।"

"হয়তো টেলিভিশনে আমাদের দেখছে।"

"বাথরুমে নিয়ে যাই, সেখানে নিশ্চয়ই ক্যামেরা নেই।"

রাফি বলল, "এত নিশ্চিত হয়ো না—কিন্তু কিছু করার নেই। চলো, কাজ শুরু করি।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা প্রস্তুত হয়ে নিল। প্লেট, হাফ প্লেট, পিরিচ, কাপ, গ্লাস মিলে অনেক কিছু ছিল। সেগুলো ভেঙে ওড়নায় বেঁধে নেওয়ার পর সেটা যথেষ্ট ভারী একটা অস্ত্র হয়ে দাঁড়াল, এটি দিয়ে ঠিকভাবে মারতে পারলে মানুষটিকে অচেতন করা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

রাফি আর ঈশিতা এবার দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকে। দরজা খোলার পর তারা দরজার আড়াল থেকে বের হয়ে আসবে, প্রথমে রাফি মারবে তার ঘাড়ে, তারপর ঈশিতা। ঘাড়ে ঠিক করে মারলে যে মানুষ অচেতন হয়ে যায়, সেটা রাফি আজ সকালেই দেখেছে। তারা ফিফথ ডিগ্রি ব্ল্যাক বেল্ট নয়, কিন্তু যখন কেউ একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তখন সে হয়তো ব্ল্যাক বেল্ট থেকেও ভয়ংকর হয়ে যেতে পারে।

রাফি ঈশিতার পিঠে হাত রেখে বলল, "ঈশিতা"।

"বলো।"

"কিছুক্ষণের মধ্যে এখানে কী ঘটবে, একটু পর কী হবে, আমরা জানি না। আমি তোমাকে আবার কিছু বলার সুযোগ পাব কি না, সেটাও জানি না। তাই তোমাকে এখন একটা কথা বলি।"

"বলো।"

"তুমি খুব চমৎকার একটা মেয়ে।"

"থ্যাংকু।"

"আমি যদি তোমার মতো একটা মেয়ের কাছাকাছি বাকি জীবনটা কাটাতে পারতাম, তাহলে আর কিছু চাইতাম না।"

ঈশিতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "যদি আমরা দুজনেই এখন মরে যাই, তাহলে এক অর্থে তোমার কথাটা সত্যি হবে।"

রাফি হেসে ফেলল। বলল, "কিন্তু আমি সেই অর্থে এটা সত্যি করতে চাই না। আমি চাই সত্যিকার অর্থে—"

ঠিক তখন দরজায় খুট করে শব্দ হলো, তারপর চাবি দিয়ে দরজা খুলে মানুষটি ভেতরে ঢুকল। সে কিছু বোঝার আগেই রাফি আর ঈশিতা তার ওপর চিতা বাঘের ক্ষীপ্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষটি কিছু বোঝার আগেই কাটা কলাগাছের মতো মেঝেতে পড়ে যায়।

দরজাটা বন্ধ করে তারা মানুষটিকে দেখে, সত্যি সত্যি অচেতন হয়ে আছে। রাফি তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট একটা রিভলবার পেয়ে যায়। সে কখনো রিভলবার ব্যবহার করেনি—ট্রিগার টানলেই গুলি হয়, নাকি আগে অন্য কিছু করতে হয়, সে জানে না। গল্প-উপন্যাসে সেফটি ক্যাচের কথা পড়েছে। সেটি কী, কে জানে!

রাফি ঈশিতাকে বলল, "চলো, বের হই।"

"চলো। রিভলবারটা আছে তো?"

রাফি মাথা নাড়ল, "আছে। তুমি?"

"আমার হাতে তোমার ওড়না দিয়ে বানানো মুগুরটা থাকুক। জিনিসটা যথেষ্ট কার্যকর, সেটা তো পরীক্ষা করে দেখলাম।"

"হ্যাঁ, সেটা দেখেছি।" রাফি হাসার চেষ্টা করল কিন্তু হাসিটি খুব কাজে এল না।

দুজনে বের হয়ে আসে। বাইরে থেকে ঘরটিতে তালা মেরে তারা করিডর ধরে হাঁটতে থাকে। তাদের শ্বাপদের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সমস্ত শরীর ইস্পাতের মতো টান টান হয়ে আছে উত্তেজনায়।

আমারবই.কম
amarboi.com

১১.

শারমিনকে একটা চেয়ারে উঁচু করে বসানো আছে। তার হাত-পা-শরীর বেল্ট দিয়ে বাঁধা। মাথায় একটা হেলমেট পরানো আছে, সেখান থেকে অসংখ্য তার বের হয়ে এসেছে। ঘর বোঝাই যন্ত্রপাতি, সেখান থেকে একটা চাপা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। শারমিনের সামনে একটা বড় মনিটর, সেখানে অসংখ্য নকশা এবং সংখ্যা খেলা করছে।

আমার বই . কম
amarboi.com

শারমিনকে সকাল থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে। তার মস্তিষ্কের ত্রিমাত্রিক একটা ছবি নেওয়া হয়েছে—অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তার মস্তিষ্কের প্রায় প্রতিটি কোষ, প্রতিটি সিনাপ্সের তথ্য নেওয়া হয়েছে। সে যখন মস্তিষ্ক ব্যবহার করে, তখন সেখানে কী পরিমাণ অক্সিজেন যায়, মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে কী পরিমাণ তাপমাত্রার জন্ম নেয়, এইমাত্র সেই পরীক্ষাটি শেষ করা হয়েছে। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "আমি যে রকম আশা করেছিলাম, ঠিক তা-ই। মেয়েটার মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক অক্সিজেন খরচ হয়। সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে এ রকম অক্সিজেন খরচ হলে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কথা।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "দেখতেই পাচ্ছ, এটা সাধারণ মস্তিষ্ক নয়। এটা যে হওয়া সম্ভব, আমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না।"

কম কথা বলে মানুষটি ভারী গলায় বলল, "আমাদের প্রতি নিশ্চয়ই ঈশ্বরের এক ধরনের করুণা আছে। তা না হলে আমরা কেমন করে এই মেয়েটিকে পেলাম। অন্য কেউও তো একে পেতে পারত!"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "এই মেয়েটির শরীরের প্রত্যেকটা কোষ আমরা ক্লোন করার জন্য মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করতে পারি।"

"হ্যাঁ। মেয়েটার মস্তিষ্কের টিস্যু বিক্রি করতে পারি প্রতিগ্রাম বিলিয়ন ডলারে!"

"আর আমরা স্ক্যান করে যেটা পেয়েছি, সেটা?"

"সেটা আমরা কাউকে দেব না।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "কাউকে না?"

"না।"

"এনডেভারকেও না?"

"এনডেভারকে দিতে হবে, আমরা কোথায় সেই চুক্তি করেছি? আমাদের চুক্তি সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কে ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে ইন্টারফেস তৈরি করার—এ রকম একটি জিনিয়াসের মস্তিষ্কে এনালাইসিসের জন্য কোনো চুক্তি হয়নি। এনডেভার যদি চায়, তাহলে তাদের নতুন করে আমাদের সাথে চুক্তি করতে হবে।"

কম কথা বলে মানুষটি বলল, "তোমার কথা শুনলে বব লাস্কি খুব খুশি হবে মনে হয় না!"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বলল, "তোমার বব লাস্কি এখন আমাদের কাছে একটা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু নয়। তাকে খুশি রাখার দায়িত্ব আমার না।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "ঠিক আছে, তাহলে কাজ শুরু করে দেওয়া যাক।"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মাথা চুলকে বলল, "আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলা। আমাদের কথা বোঝে না। যখন ভয় পাওয়ার কথা নয়, তখন ভয় পেয়ে বসে থাকে!"

"হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটির মাস্টার আর ওই সাংবাদিক মেয়েটাকে ধরে এনে এখানে বেঁধে রাখলে আমাদের কথাবার্তা অনুবাদ করতে পারত।"

মানুষগুলো তখনো জানে না, রাফি আর ঈশিতা ঠিক তখন চুপি চুপি তাদের কাছেই এসেছে।

পায়ের শব্দ শুনে রাফি আর ঈশিতা ঠিক তখন চুপি চুপি বাঁ দিকের একটা ছোট করিডরে ঢুকে গেল। করিডর ধরে একজন নার্স তার জুতার শব্দ তুলে হেঁটে চলে গেল। দুজন তখন আবার বের হয়ে সতর্কভাবে হাঁটে। ঠিক কোথায় শারমিন আছে, তারা জানে না। ঠিক কীভাবে তাকে খুঁজে বের করতে হবে, কিংবা খুঁজে বের করলেও ঠিক কীভাবে তাকে মুক্ত করবে,

সেটাও তারা জানে না। তাদের হাতে এখন একটা সত্যিকারের অস্ত্র আছে, সেটা দিয়ে কাউকে জিম্মি করে কিছু একটা করা যায় কি না, সেটাই তাদের লক্ষ্য।

করিডর ধরে হেঁটে তারা কোনো কিছু খুঁজে পেল না এবং ঠিক তখন একজন বিদেশি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রাফির হাতে রিভলবার এবং দুজনের শরীরে রক্তের ছোপ, তাদের চেহারায় একটা বেপরোয়া ভাব, বিদেশি মেয়েটি হকচকিয়ে গেল। হয়তো আর্তচিৎকার করে উঠত, রাফি সেই সুযোগ দিল না, রিভলবারটা মাথায় ঠেকিয়ে বলল, "খবরদার, টুঁ শব্দ করবে না।"

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে বলল, "আমি কিছু জানি না। আমি কিছু করিনি।"

"আমি জানি, তুমি কিছু করনি, কিন্তু তুমি কিছু জানো না, সে ব্যাপারে আমি এত নিশ্চিত নই। গণিতের সেই প্রডিজি মেয়েটা কোথায়?"

"গণিতের কোন মেয়েটা?"

"অসাধারণ প্রতিভাবান সেই মেয়েটা, যাকে তোমরা তুলে এনেছ। মস্তিষ্ক কেটেকুটে নেওয়ার চেষ্টা করছ।"

বিদেশি মেয়েটি কাঁপা গলায় বলল, "বিশ্বাস করো, আমি এ সম্পর্কে কিছুই জানি না।"

amarboi.com

"তুমি কি বব লাস্কিকে চেনো?"

"চিনি।"

"ঠিক আছে, আমাদের তাহলে বব লাস্কির কাছে নিয়ে যাও। খবরদার, কোনো রকম হ্যাংকি-প্যাংকি করবে না।"

"করব না। কোনো রকম হ্যাংকি-প্যাংকি করব না। বিশ্বাস করো।"

বিদেশি মেয়েটি কয়েক মিনিটে তাদের বব লাস্কির অফিসে নিয়ে গেল। রাফি লাথি দিয়ে অফিসের দরজাটি খুলে রিভলবার তুলে চিৎকার করে বলল, "হাত ওপরে তোলো, বব লাস্কি।"

বিশাল একটা টেবিলের সামনে বসে থাকা বব লাস্কি হতচকিত হয়ে তাদের দিকে তাকাল। তার চোখে অবিশ্বাস। রাফি চিৎকার করে বলল, "হাত তোলো আহম্মক। না হলে এই মুহূর্তে আমি গুলি করব।"

বব লাস্কি আহাম্মক নয়, তাই সে এবার হাত ওপরে তুলল। রাফির কণ্ঠস্বরের তীব্রতা সে টের পেয়েছে।

"দুই হাত ওপরে তুলে বের হয়ে এসো।"

বব লাস্কি দুই হাত ওপরে তুলে বের হয়ে এল। রাফির কাছাকাছি এসে বলল, "ইয়াং ম্যান। আমরা নিশ্চয়ই কোনো এক ধরনের সমঝোতায় আসতে পারি।"

কথার মাঝখানে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে রাফি তাকে থামিয়ে দেয়, "খবরদার, কথা বলবে না। খুন করে ফেলব আমি। শারমিনের কাছে নিয়ে যাও আমাদের। দশ সেকেন্ড সময় দিলাম আমি।"

বব লাস্কি বলল, "ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি আমি। কিন্তু দশ সেকেন্ডে তো সম্ভব নয়—"

রাফি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমি কোনো কিছু পরোয়া করি না। দরকার হলে তুমি দৌড়াও। দৌড়াও! ডবল মার্চ!"

বব লাস্কি আর কথা বলার সাহস করল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে। সে এখনো বুঝতে পারছে না, দাবার চালটি কেমন করে উল্টে গেল।

করিডর ধরে সোজা হেঁটে গিয়ে বব লাস্কি ডান দিকে ঢুকে গেল, সেখান দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁ দিকে একটা আলোকোজ্জ্বল ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "এইটা সেই ঘর।"

আমার বই . কম
amarboi.com

"শারমিন এখানে?"

"হ্যাঁ।"

"দরজা খোলো।"

বব লাস্কি ইতস্তত করতে থাকে। রাফি হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আমি বলছি, দরজা খোলো।"

বব লাস্কি দরজায় গোপন সংখ্যা প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে খুট করে দরজা খুলে যায়। রাফি লাথি দিয়ে দরজা খুলে বব লাস্কিকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

ঘরের ভেতর চারজন মানুষ মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে হতবাক হয়ে গেল। ঘরের এক কোনায় একটা চেয়ার, সেখানে নানা রকম স্ট্র্যাপ দিয়ে শারমিনকে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার মাথায় একটা হেলমেট, সেখান থেকে অসংখ্য তার বের হয়ে আসছে। ঈশিতা ও রাফিকে দেখে শারমিন ডুকরে কেঁদে উঠে বলল, "ঈশিতা আপু! আমাকে এরা মেরে ফেলবে!"

ঈশিতা বলল, "না শারমিন, তোমাকে কেউ মারতে পারবে না। আমরা তোমাকে ছুটিয়ে নিতে এসেছি।" ঈশিতা শারমিনের কাছে গিয়ে তার বাঁধনগুলো খুলতে থাকে।

রাফি বব লাস্কিকে ধাক্কা দিয়ে অন্য মানুষগুলোর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, "খবরদার, কেউ নড়বে না।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "যদি নড়ি, তাহলে কী করবে?"

"গুলি করে দেব।"

নীল মানুষটি শব্দ করে হেসে বলল, "তুমি আগে কখনো কাউকে গুলি করেছ?"

রাফি হিংস্র গলায় বলল, "আমি এখন তোমার সঙ্গে সেটা নিয়ে কথা বলতে চাই না।"

নীল চোখের মানুষটি হেসে বলল, "অবশ্যই তুমি সেটা নিয়ে কথা বলতে চাইবে না। কারণ, সেটা নিয়ে কথা বললে দেখা যাবে, তুমি মানুষ তো দূরে থাকুক, তুমি হয়তো কখনো একটা মশাও মারনি! রক্ত দেখলেই হয়তো তোমার নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়ে যায়! কাজেই তুমি হয়তো কোনো না কোনোভাবে একটা রিভলবার জোগাড় করে ফেলেছ, কিন্তু সেখানে ট্রিগার টানাটা তোমার জন্য এত সোজা নয়।"

আমার বই. কম
amarboi.com

রাফি বুঝতে পারে, এ মানুষটি যা বলছে, তার প্রতিটি কথা সত্যি। সে রিভলবার দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে সত্যি, কিন্তু যখন প্রয়োজন হবে, তখন সে গুলি করতে পারবে না। কিন্তু এটি তো কখনোই তাদের বুঝতে দেওয়া যাবে না। বব লাস্কিকে যে রকম ভয় দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে, এদেরও ঠিক সেভাবে ভয় দেখাতে হবে। রাফি তাই চিৎকার করে হিংস্র মুখে বলল, "খবরদার! একটা বাজে কথা বলবে না। যে যেখানে আছ, সে সেখানেই হাত তুলে দাঁড়াও।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আমি হাত তুলছি না। দেখি, তুমি আমাকে গুলি করতে পার কি না।"

রাফি আবার চিৎকার করে বলল, "তোলো হাত। না হলে গুলি করে দেব।"

"করো গুলি।" বলে নীল চোখের মানুষটি এক পা এগিয়ে এসে বলল, "করো।"

রাফি বুঝতে পারল, সে হেরে যাচ্ছে, মানুষটি তার দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে এবং সে কিছুতেই তাকে গুলি করতে পারবে না।

কিন্তু কিছুতেই সে হেরে যেতে পারবে না। কিছুতেই না। সে হিংস্র গলায় বলল, "খবরদার! আর কাছে আসবে না।"

নীল চোখের মানুষটি মধুরভাবে হাসল। বলল, "এই যে আরও কাছে এসেছি। কী করবে তুমি? গুলি করবে? করো।"

রাফি ভাঙা গলায় আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল, তখন নীল চোখের মানুষটি শব্দ করে হেসে ফেলল। বলল, "শোনো ছেলে, আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি, তুমি আসলে জীবনে হাতে কখনো কোনো রিভলবার ধরনি। তুমি যেভাবে রিভলবারটা ধরেছ, এভাবে ধরে গুলি করলে গুলি টার্গেটে লাগবে না, ওপর দিয়ে চলে যাবে। দুই হাতে ধরতে হয়, আরেকটু নিচু করে ধরতে হয়। তা ছাড়া রিভলবারে সেফটি ক্যাচ বলে একটা জিনিস থাকে, সেটা ঠিক করে না নিলে গুলি বের হয় না। তুমি ট্রিগার টেনে দেখো, কোনো গুলি বের হবে না।"

রাফি ট্রিগার টেনে দেখার চেষ্টা করল না। অবাক হয়ে নীল চোখের মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইল। নীল চোখের মানুষটি এতক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল, সেই চোখে ছিল এক ধরনের উত্তেজনা। হঠাৎ করে সেই চোখ দুটির উত্তেজনাও নিভে যায়, তাকে কেমন জানি বিষণ্ন দেখায়। মানুষটি ক্লান্ত গলায় বলল, "এই ছেলে, তুমি আসলে খুব বড় নির্বোধ। তুমি যখন এই ঘরে ঢুকেছ, ঠিক তখন আমি অ্যালার্মে চাপ দিয়েছি। সিকিউরিটির লোকজন আসছে, যতক্ষণ এসে হাজির না হচ্ছে, আমি ততক্ষণ তোমাকে একটু ব্যস্ত রাখতে চেয়েছিলাম, আর বেশি কিছু নয়। ওরা এসে গেছে।"

মানুষটার কথা শেষ হওয়ার আগেই সশব্দে দরজাটা খুলে যায় এবং হুড়মুড় করে ভেতরে কয়েকজন মানুষ ঢোকে। তাদের সবার হাতে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। কিছু বোঝার আগেই তারা রাফিকে জাপটে ধরে ফেলল এবং তাকে নিচে ফেলে দিয়ে তার হাতটা উল্টো দিকে ভাঁজ করে চেপে ধরে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় রাফি চিৎকার করে ওঠে। রাফি শুনতে পেল, বব লাস্কি চিৎকার করে বলল, "মেরে ফেলো! মেরে ফেলো এই দুই আহাম্মককে।"

রাফি তার কানের নিচে শীতল একটা ধাতব স্পর্শ অনুভব করল। সাথে সাথে সে একজন অনুভূতিহীন মানুষে পরিণত হয়ে যায়। তার ভেতর ভয়-

আমার বই. কম
amarboi.com

ভীতি, দুঃখ-বেদনা কোনো অনুভূতিই নেই। সে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

ঠিক তখন দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "এক সেকেন্ড। মারতেই যদি হয়, ল্যাবের ভেতরে নয়, বাইরে। খুনোখুনি দেখে প্রডিজি মেয়েটার উল্টো প্রতিক্রিয়া হতে পারে। আমাদের এক্সপেরিমেন্টের সমস্যা হবে।"

রাফি অনুভব করল, ধাতব শীতল নলটি তার কানের নিচ থেকে সরে যাচ্ছে। কেউ একজন তাকে টেনে সোজা করে। রাফি বুকের ভেতর আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের করে ঘরের ভেতর তাকাল। দুজন মানুষ ঈশিতাকে দুই পাশ থেকে ধরে রেখেছে। কাছেই একটা চেয়ারে শারমিন স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা, সে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে আছে, তার চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি ঝরছে।

দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "এ দুজনকে কয়েক মিনিট এখানে রাখো। এরা আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা দেখে যাক।"

বব লাস্কি বলল, "এদের দেখিয়ে কী লাভ?"

"কোনো লাভ নেই। সবকিছুই মানুষ লাভের জন্য করে, কে বলেছে? তারা যে বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য এত ঝামেলা করছে, আমরা সেই বাচ্চাকে দিয়ে কী করতে পারি, তার একটা ধারণা নিয়ে ঈশ্বরের কাছে ফেরত যাক।"

আমার বই . কম
amarboi.com

বব লাস্কি বলল, "তোমার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কাজ করত। মানুষকে অত্যাচার করে তুমি অন্য রকম আনন্দ পাও।" দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি আনন্দে হা হা করে হেসে বলল, "এই যে মাস্টার সাহেব ও সাংবাদিক সাহেব, আমাদের এই যন্ত্রটার নাম ট্রান্সকিনিওয়াল ইন্টারফেস। এটা মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিতে পারে। দেখা গেছে, এটা দিয়ে মানুষের মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা আমাদের সব টেস্ট করেছি, এখন এই টেস্ট করা বাকি। আমরা এখন এই বাচ্চাটির মাথার নির্দিষ্ট স্থানে খুব হাই ফ্রিকোয়েন্সির ম্যাগনেটিক ফিল্ড দেব। আমরা তার অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব এবং সবচেয়ে বড় কথা, তার গাণিতিক ক্ষমতাটাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।"

রাফি আর ঈশিতা কোনো কথা বলল না। শারমিন কাঁদতে কাঁদতে বলল, "স্যার, ঈশিতা আপু। কী বলছে এ মানুষগুলো?"

রাফি কী বলবে বুঝতে পারল না। মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু দিয়ে কী লাভ?

দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "অক্সিজেন সাপ্লাই ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"অক্সিজেন-নাইট্রোজেনের অনুপাত?"

"চব্বিশ আর ছিয়াত্তর।" মানুষটি হঠাৎ থেমে বলল, "কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

"খুবই বিচিত্র। আমরা মিথেনের একটা লাইন দেখছি।"

"কীসের লাইন?"

"মিথেনের। খুবই কম। কিন্তু নিশ্চিত, মিথেনের লাইন।"

"কী বলছ তুমি? আমাদের এই স্পেকট্রামে মিথেনের লাইন থাকার অর্থ কী, তুমি জানো?"

"জানি। এর অর্থ পুরো বিল্ডিং মিথেন দিয়ে বোঝাই, সেখান থেকে লিক করে এখানে ট্রেস অ্যামাউন্ট দেখা যাচ্ছে।"

দাড়ি-গোঁফোর জঙ্গল মানুষটি বলল, "হ্যাঁ। এটা সম্ভব নয়। এখানে মিথেন আসার কোনো উপায় নেই। নিশ্চয়ই মাস স্পেকট্রোমিটারটা ঠিক করে কাজ করছে না।"

"নিশ্চয়ই তা-ই।" সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ে। শুধু রাফি বুঝতে পারল, কী ঘটেছে। মাজু বাঙালি এসে যন্ত্রপাতির ঘরগুলোয় অক্সিজেন-মিথেন দিয়ে বোঝাই করেছে। এখন দরকার শুধু একটা স্পার্ক। তাহলেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে এনডেভারের একটা অংশ উড়ে যাবে। উত্তেজনায় রাফির বুক ধক ধক করে শব্দ করতে থাকে।

আমার বই.কম
amarboi.com

দাঁড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি কয়েকটা যন্ত্রের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, "আমরা শুরু করছি।"

"কোনটা দিয়ে শুরু করবে?"

"সোজা কিছু দিয়ে শুরু করি। ঘুম।"

"ঠিক আছে।" মানুষটি একটা নব ঘুরিয়ে বলল, "নাইনটি থ্রি গিগা।"

"চমৎকার।"

"এমপ্লিচুড অপটিমাল।"

"চমৎকার।"

"মেয়েটা এখন শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়বে।"

সবাই শারমিনের দিকে তাকাল। শারমিন চোখ বড় বড় করে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে মোটেই ঘুমিয়ে পড়েনি।

শারমিন মানুষগুলোর কথা বুঝতে পারছিল না, কিন্তু এক-দুটি শব্দ থেকে অনুমান করছিল, তাকে দিয়ে কোনো একটা পরীক্ষা করাবে। নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনো পরীক্ষা। পরীক্ষাটি কী, সে বুঝতে পারছিল না, কিন্তু সে প্রস্তুত হয়ে রইল। হঠাৎ করে তার চোখে ঘুম নেমে আসতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শারমিন বুঝে যায়, পরীক্ষাটি কী। যন্ত্র দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। কিন্তু শারমিন ঘুমাবে না, সে কিছুতেই ঘুমাবে না। শারমিন জোর করে নিজেকে জাগিয়ে রাখল। হঠাৎ ঢেউয়ের মতো করে ঘুম এসে তাকে ভাসিয়ে নিতে চায়, কিন্তু শারমিন তাকে কিছুতেই ভাসিয়ে নিতে দিল না। দাঁতে দাঁত চেপে জেগে রইল। বিড়বিড় করে নিজেকে বলল, "ঘুমাব না। আমি ঘুমাব না। কিছুতেই ঘুমাব না।"

শারমিন জোর করে চোখ বড় বড় করে জেগে রইল আর সেটি দেখে নীল চোখের মানুষটি চিন্তিত মুখে বলল, "দেখেছ? মেয়েটা ঘুমাচ্ছে না।"

"হ্যাঁ, আগে কখনো দেখিনি। আমি থ্রি ডিবি বেশি পাওয়ার দিচ্ছি, তার পরও ঘুম পাড়ানো যাচ্ছে না।"

"আরও থ্রি ডিবি বাড়াও।"

একজন নব ঘুরিয়ে শারমিনের মাথায় আরও বেশি পাওয়ার দিতে শুরু করল। শারমিনের চোখ ভেঙে ঘুম আসতে চাইছিল, কিন্তু সে তবু জোর করে জেগে রইল।

amarboi.com

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি তার দাড়ি চুলকাতে চুলকাতে বলল, "আমরা ইচ্ছে করলে আরও পাওয়ার বাড়াতে পারি, কিন্তু আমি সেটা করতে চাচ্ছি না।"

"কেন? মেয়েটার ক্ষতি হবে?"

"না, সে জন্য নয়। আমাদের কয়েলটা একটা সিগনাল পাঠাচ্ছে, তার মস্তিষ্কের সেটা গ্রহণ করার কথা। মনে হচ্ছে, তার মস্তিষ্ক সেটা গ্রহণ না করে ফিরিয়ে দিচ্ছে—"

"কী বলছ পাগলের মতো?"

"আমি পাগলের মতো মোটেই বলছি না। তাকিয়ে দেখো। হেলমেটের ভেতর যে কয়েল আছে, সেটা এই মেয়েটার মস্তিষ্ক থেকে এই সিগনালটা পিক করছে। পজিটিভ ফিডব্যাকের মতো—এটা বেড়ে আমাদের সোর্সে যাচ্ছে। তাপমাত্রা কত বেড়েছে, দেখেছ?"

"ও মাই গড!" যে মানুষটি কম কথা বলে, সে এবার কথা বলল, "আমি এটা বিশ্বাস করি না!"

"সেটা তোমার ইচ্ছা। কিন্তু আসল সত্যটি হচ্ছে, আমরা মেয়েটার মস্তিষ্ককে বশ করতে পারছি না। উল্টো মেয়েটা আমাদের জেনারেটরকে ওভার লোড করে দিচ্ছে।"

চারজন মানুষ কিছুক্ষণ তাদের যন্ত্রপাতির দিকে তাকিয়ে রইল এবং মাথা চুলকাল, তখন একজন বলল, "সার্ভারে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। ট্রান্সকিনিওয়াল জেনারেটরটা বন্ধ করো।"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আরও একবার চেষ্টা করে দেখি।"

"কী চেষ্টা করবে?"

"এক শ চুয়াল্লিশ গিগা হার্টজ!"

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি বলল, "আতঙ্ক?"

"হ্যাঁ, আতঙ্ক। ভয়াবহ আতঙ্ক।"

"মেয়েটার ক্ষতি হবে না তো? মনে নেই, একজন কখনো রিকভার করতে পারল না। পাকাপাকিভাবে স্কিতজোফ্রেনিয়া হয়ে গেল?"

নীল চোখের মানুষটি ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "দেখা যাক।"

মানুষগুলো যন্ত্রের নব ঘুরিয়ে সিগনাল পাওয়ার কমিয়ে আনতেই শারমিন হঠাৎ করে যেন জেগে ওঠে। তার ভেতরে যে প্রচণ্ড ঘুমের চাপ ছিল হঠাৎ করে সেটা পুরোপুরি দূর হয়ে গেল। শারমিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, মানুষগুলো একটু উত্তেজিত হয়ে আবার যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়েছে। সে বুঝতে পারে, তারা এখন আবার কিছু একটা করবে। কী করবে, কে জানে!

আমারবই.কম
amarboi.com

হঠাৎ করে শারমিনের কেমন যেন ভয় করতে থাকে। সে বুঝতে পারে না, কেন তার ভয় করছে। শারমিন মাথা ঘুরিয়ে এদিক-সেদিক তাকাল, কী নিয়ে তার ভয়, সেটা সে বোঝার চেষ্টা করল।

মানুষগুলো নব ঘুরিয়ে সিগনালটা বাড়িয়ে দিতেই শারমিনের ভয়টুকু ভয়াবহ আতঙ্কে রূপ নেয়, সে চোখ বন্ধ করে একটা আর্তচিৎকার করে ওঠে।

দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল মানুষটি নিজের গাল চুলকে সন্তুষ্টির ভান করে মাথা নেড়ে বলল, "এইটা ঠিক ঠিক কাজ করছে। দেখেছ?"

নীল চোখের মানুষটি বলল, "আগেই এত নিশ্চিত হয়ো না। সিগনাল পাওয়ার আরও কয়েক ডিবি বাড়াও। হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ হতে হবে, সারা শরীর ঘামতে হবে, চিৎকার করে গলায় রক্ত তুলে দেবে, তখন আমি নিশ্চিত হব।"

কম কথার মানুষটি নবটা ঘুরিয়ে সিগনাল আরও বাড়িয়ে দিল। শারমিন সাথে সাথে থরথর করে কেঁপে ওঠে, আতঙ্কে ভয়াবহ একটা চিৎকার করতে গিয়ে সে থেমে গেল। সে বিড়বিড় করে নিজেকে বোঝাল, "মিথ্যা! মিথ্যা! সব মিথ্যা। ওরা আমাকে ভয় দেখাচ্ছে, আসলে ভয়ের কিছু নেই। আমি ভয় পাব না, কিছুতেই ভয় পাব না। কিছুতেই না। কিছুতেই না!"

শারমিন প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত করে, পুরো ভয়টুকু জোর করে নিজের মাথা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। সে চোখ বন্ধ করে অন্য কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করে, বিড়বিড় করে বলে, "আমি ভয় পাব না। কিছুতেই ভয় পাব না। এই মানুষগুলো আমাকে যন্ত্র দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, কিন্তু আসলে ভয়ের কিছু নেই। আমি সুন্দর জিনিস চিন্তা করব, যেন ভয় না করে। আমি আমার মায়ের কথা চিন্তা করব। ছোট ভাইটার কথা চিন্তা করব, সে কেমন ফোকলা দাঁতে হাসে, সেই কথাটা চিন্তা করব।" শারমিন তার চোখের সামনে তার সব প্রিয় দৃশ্যগুলো নিয়ে আসে, নীল আকাশে সাদা মেঘ, একটা গাছের ডালে হলুদ রঙের একটা পাখি, বাগানে ফুলের গাছে রঙিন ফুল। পানির ওপর একটা গাছের ডাল, সেখানে একটা রঙিন মাছরাঙা পাখি।

যন্ত্রপাতির প্যানেলের সামনে দাঁড়িয়ে মানুষগুলো মাথা চুলকাল। নীল চোখের মানুষটি বলল, "একই ব্যাপার হচ্ছে। পুরো সিগনালটা রিফ্লেক্ট করতে শুরু করেছে।"

"শুধু তা-ই নয়, আমাদের কয়েল নতুন সিগনাল পিক করছে। কোনো আইসলেটর নেই, তাই সরাসরি সিস্টেমে ঢুকে যাচ্ছে। পজিটিভ ফিডব্যাকের মতো। জেনারেটরের ক্ষতি হতে পারে!"

নীল চোখের মানুষটির কেমন যেন রোখ চেপে গেল, দাঁতে দাঁত ঘষে হিংস্র মুখে বলল, "বাড়াও! সিগনাল আরও বাড়াও।"

শারমিনের ভেতর আবার ভয়াবহ আতঙ্ক উঁকি দিতে চায়। শারমিন জোর করে সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। মনে মনে নিজেকে বলে, "আমি কিছুতেই ভয় পাব না। কিছুতেই না! আমার কাছে যেটা করতে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, আমি সেটাই করব! রাফি স্যার আমাকে প্রাইম সংখ্যা শিখিয়েছে। আমি শেষবার যেই প্রাইম সংখ্যা বের করেছিলাম, সেটা ছিল দুই শ একাত্তর অঙ্কের। আমি এখন পরেরটা বের করব। আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে দেব এখানে, তাহলে কোনো কিছু আমার মাথায় ঢুকতে পারবে না। কেউ আমার মনোযোগ নষ্ট করতে পারবে না। কেউ না!"

শারমিন তার মাথায় একটার পর একটা সংখ্যা সাজাতে থাকে। ধীরে ধীরে তার চারদিকে যেন সংখ্যার একটা দেয়াল উঠতে থাকে। সেই দেয়াল ভেদ করে কোনো কিছু শারমিনের কাছে পৌছাতে পারে না। শারমিন চোখ বন্ধ করে চেয়ারে হেলান দেয়। তার মুখে প্রশান্তির একটা হাসি ফুটে ওঠে।

নীল চোখের মানুষটি অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শারমিনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না, যে সিগনালে একজন মানুষের ভয়াবহ অমানুষিক আতঙ্কে চিরদিনের জন্য উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কথা, সেই সিগনালে এই মেয়েটি পরম প্রশান্তিতে শুয়ে আছে—তার মুখে বিচিত্র একটা হাসি। মানুষটির কেমন যেন রোখ চেপে যায়, সে নবটিকে স্পর্শ করল।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরা বলল, "আর বাড়িও না। আমাদের যন্ত্র আর সহ্য করতে পারবে না।"

"না পারলে, নাই।" নীল চোখের মানুষটি হিংস্র মুখে বলল, "আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব।"

সে নবটি পুরোপুরি ঘুরিয়ে দেয়। শারমিন সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে বলল, "না! না! না!"

ঠিক তখন পুরো ঘরে একটা বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে পুরো এনডেভার কেঁপে ওঠে। ঘরটি সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে যায়, যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে ছিটকে পড়তে থাকে। প্রথম বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আরেকটা বিস্ফোরণ হলো, সেটি হলো আগের চেয়েও জোরে। পুরো এনডেভারের ভবন থরথর করে কেঁপে ওঠে—রাফি টের পেল যে মানুষটি তাকে ধরে রেখেছিল, সে ছিটকে পড়েছে। তাকে ছেড়ে দিয়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছে।

আমার বই . কম
amarboi.com

রাফি দেয়াল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল, ঠিক তখন আরও ভয়ংকর দুটো বিস্ফোরণ হলো। কোথায় জানি আগুন লেগেছে, আগুনের শিখায় ঘরের ভেতর আবছা দেখা যাচ্ছে।

রাফি দেখল, ঘরের কোনায় চেয়ারে বসে আছে শারমিন, ঈশিতা তাকে জড়িয়ে ধরেছে। রাফি টলতে টলতে সেদিকে এগিয়ে যায়। দুজনকে ধরে বলল, "ভয় পেয়ো না তোমরা, ভয় পেয়ো না।"

ঈশিতা জিজ্ঞেস করল, "কিসের বিস্ফোরণ?"

"মাজু বাঙালি। সে রেডি করে দিয়েছে, শারমিন শুরু করিয়ে দিয়েছে—"

রাফি কথা শেষ করতে পারল না, তার আগেই পরপর আরও দুটো বিস্ফোরণ হলো, তার প্রচণ্ড ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ল। চারদিকে আগুন লেগেছে। অনেক মানুষ ছোটাছুটি করছে, তাদের আতঙ্কিত চিৎকার শোনা যাচ্ছে। অনেক দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসতে থাকে।

রাফি উঠে বসার চেষ্টা করল, চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। তার মাঝে দেখতে পেল দূর থেকে দুলতে দুলতে অনেক দূর থেকে অনেকগুলো টর্চলাইটের আলো ছুটে আসছে। তার মানে, অনেক মানুষ ছুটে আসছে। কে মানুষগুলো?

টর্চলাইটের আলো ঘরের সামনে এসে থেমে যায়। হঠাৎ করে সে শুনতে পেল, কেউ একজন ডাকছে, "ঈশিতা! রাফি! শারমিন! তোমরা কোথায়?"

রাফি গলার স্বর চিনতে পারে। মাজু বাঙালি। আর তাদের ভয় নেই।

মাজু বাঙালি আবার ডাকল, "রাফি! ঈশিতা!"

রাফি ভাঙা গলায় বলল, "আমরা এখানে।"

রাফি দেখতে পায়, অনেকগুলো টর্চলাইটের আলো তাদের দিকে ছুটে আসছে। পেছনের মানুষগুলোকে দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু রাফি জানে, না দেখতে পেলেও ক্ষতি নেই। এরা সবাই তার আপনজন। এরা তাদের বাঁচাতে ছুটে আসছে।

আমার বই. কম
amarboi.com

১২.

শারমিন এনডেভারের হাসপাতালের সবুজ রঙের একটা গাউন পরে শীতে তিরতির করে কাঁপছিল, সে দুটি হাত তার বুকের কাছে ধরে রেখেছে। চারপাশে অসংখ্য মানুষের ভিড়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কম বয়সী তরুণ-তরুণী। সুহানা নেটওয়ার্কিং ল্যাবের কম্পিউটারের লগ দেখে পুরো ব্যাপারটা আন্দাজ করে ফেসবুকে, টুইটারে খবরটা ছড়িয়ে দিয়েছিল। এনডেভারের ভেতর ঈশিতা, রাফি আর শারমিনকে আটকে রাখা হয়েছে, আর শারমিন হচ্ছে সম্ভাব্য সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ—এ তথ্যটি জানাজানি হওয়ার পর হাজার হাজার কম বয়সী ছেলেমেয়ে এনডেভারের সামনে ভিড় করেছে। পুলিশ সেই ভিড়ের কাছ থেকে রক্ষা করে ঈশিতা, রাফি আর শারমিনকে একটা অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। মাঝখানে অনেকগুলো টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান তাদের থামাল। একজন জিজ্ঞেস করল, "এই মেয়েটিই কি সেই প্রতিভাবান মেয়ে শারমিন?"

রাফি উত্তর দিল, "হ্যাঁ।"

"এটি কি সত্যি, সে মুখে মুখে যেকোনো সংখ্যার সঙ্গে যেকোনো সংখ্যা গুণ করতে পারে?"

রাফি বলল, "হ্যাঁ। এটা সত্যি।"

"আমরা কি তার একটা প্রমাণ দেখতে পারি।"

ঈশিতা বলল, "মেয়েটি অত্যন্ত টায়ার্ড। তার ওপর দিয়ে কী গিয়েছে, আপনারা সেটা কল্পনাও করতে পারবেন না। তাকে হাসপাতালে নিতে দিন। প্লিজ!"

একজন সাংবাদিক বলল, "অবশ্যই দেব। শুধু ছোট একটা ডেমনস্ট্রেশান, আমাদের দর্শকদের জন্য।"

আমার বই কম
amarboi.com

রাফি জিজ্ঞেস করল, "কী দেখতে চান?"

"দুটি সংখ্যা গুণ করে দেখাতে বলেন।"

"আপনারা বলেন দুটি সংখ্যা।"

একজন সাংবাদিক বলল, "উনিশ শ বাহান্নর সঙ্গে উনিশ শ একাত্তর গুণ করলে কত হয়?"

শারমিনকে কেমন জানি বিভ্রান্ত দেখায়। সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, "আটচল্লিশ লাখ—আটচল্লিশ লাখ সাঁইত্রিশ হাজার—পাঁচ শ বারো।"

রাফি অবাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে রইল। সে কখনোই শারমিনকে কোনো সংখ্যাকে গুণ করতে গিয়ে ইতস্তত করতে দেখেনি। সাংবাদিকদের একজন তার মোবাইল টেলিফোনের ক্যালকুলেটর বের করে গুণ করে মাথা নেড়ে বলল, "হয়নি!"

রাফি গতবাক হয়ে যায়। "হয়নি?"

"না।"

"কী আশ্চর্য। শারমিন এর চেয়ে অনেক বড় সংখ্যা গুণ করতে পারে।"

"আরেকবার চেষ্টা করে দেখুক।"

"ঠিক আছে।"

ওই সাংবাদিক বলল, "দশমিকের পর পাইয়ের একশতম সংখ্যা কী?"

শারমিন কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে তারপর দ্বিধান্বিত গলায় বলে, "ছয়?"

"উঁহু হয়নি।" সাংবাদিক মাথা নাড়ে, "আমি ইন্টারনেটে দেখেছি, দশমিকের পর একশতম সংখ্যা হচ্ছে নয়।"

ঈশিতা এবার এগিয়ে গিয়ে সাংবাদিকদের থামাল, বলল, "আপনারা এবার বাচ্চাটিকে যেতে দিন।"

"কিন্তু সে কেন পারছে না?"

রাফি ইতস্তত করে বলল, "হয়তো, হয়তো সে খুব ক্লান্ত। কিংবা হয়তো তার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

"তাহলে কি আর সে কখনোই পারবে না?"

"আমরা জানি না।"

"আগে কি সত্যি পারত?"

রাফি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি সেটা নিয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।"

পুলিশ সাংবাদিকদের সরিয়ে তাদের তিনজনকে সামনে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেয়।

আমারবই.কম
amarboi.com

অ্যাম্বুলেন্সের বিছানায় শারমিন চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। রাফি তার হাতটা ধরে রেখেছে। সাইরেন বাজাতে বাজাতে অ্যাম্বুলেন্সটি ঢাকার রাজপথ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। শারমিন হঠাৎ চোখ খুলে বলল, "স্যার।"

"বলো।"

"ওই খারাপ মানুষগুলো এখন কোথায়?"

"সবাইকে পুলিশে ধরেছে।"

"সবাইকে?"

"মনে হয় সবাইকে। এক-দুজন হয়তো পালিয়েছে, পুলিশ তাদেরও ধরে ফেলবে।"

শারমিন বলল, "সত্যি ধরতে পারবে তো?"

"হ্যাঁ। পারবে।" রাফি হাসল। বলল, "তুমি চিন্তা করো না।"

শারমিন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার ডাকল, "স্যার।"

রাফি শারমিনের হাত ধরে বলল, "বলো, শারমিন।"

"আমি যে আর বড় বড় গুণ করতে পারছি না, সে জন্য কি আপনার মন খারাপ হয়েছে?"

রাফি বলল, "না, ঠিক মন খারাপ না। কিন্তু তোমার এত অসাধারণ ক্ষমতাটা ওই বদমাইশগুলো তাদের যন্ত্রপাতি দিয়ে যদি নষ্ট করে থাকে—"

শারমিন বলল, "না, নষ্ট করেনি।"

"নষ্ট করেনি?"

"না।" আমি টেলিভিশনের লোকগুলোকে ইচ্ছে করে ভুল উত্তর দিয়েছি। উনিশ শ বাহান্নকে উনিশ শ একাত্তর দিয়ে গুণ করলে হয় আটত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিন শ বিরানব্বই!"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ। আর পাইয়ের এক শ নম্বর সংখ্যা আসলেই নয়। এরপর আট, এরপর দুই, তারপর এক, তারপর চার আট শূন্য আট—আমি যখন খুশি, বের করতে পারি!"

ঈশিতা এগিয়ে এসে শারমিনের মাথায় হাত দিয়ে বলল, "তুমি টেলিভিশনের লোকগুলোকে কেন ভুল উত্তর দিলে?"

"তাহলে লোকগুলো আর কোনো দিন আমাকে নিয়ে হইচই করবে না। সারা পৃথিবীতে আমি কাউকে এটা বলতে চাই না। সবাইকে বলব, আমি পারি না। শুধু আপনারা দুজন সত্যি কথাটা জানবেন। ঠিক আছে?"

রাফি নরম গলায় বলল, "ঠিক আছে শারমিন, এটা হবে আমদের তিনজনের গোপন কথা। আমরা আর কাউকে বলব না।"

"শুধু—শুধু—" শারমিন থেমে গেল।

"শুধু কী?"

"আমার যদি অনেক অঙ্ক করার ইচ্ছে করে তাহলে আমাকে অঙ্ক বই এনে দেবেন।"

"অবশ্যই। লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে আমি ভেক্টর, টেনসর শেখাব। কমপ্লেক্স ভেরিয়েবল শেখাব, ক্যালকুলাস শেখাব। তুমি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করা শিখবে, তুমি নাম্বার থিওরি শিখবে—"

ঈশিতা রাফির হাত ধরে থামাল, বলল "থাক থাক। বাচ্চা মেয়েটাকে আর উত্তেজিত করো না!"

"ঠিক আছে, আর উত্তেজিত করব না। শারমিন তুমি এখন ঘুমাও।"

"ঠিক আছে।" শারমিন চোখ বন্ধ করল। তার মুখে শুধু একটা মিষ্টি হাসি লেগে রইল।

আবছা অন্ধকারে রাফি আর ঈশিতা পাশাপাশি বসে থাকে। রাফি বুঝতে পারে, ঈশিতার শরীরটা অল্প অল্প কাঁপছে। সে নিচু গলায় ডাকল, "ঈশিতা।"

"বলো, রাফি।"

"আমি তোমাকে ধরে রাখব?"

"রাখো।"

রাফি তখন হাত দিয়ে ঈশিতাকে শক্ত করে ধরে রাখে। ঈশিতা ফিসফিস করে বলল, "রাফি।"

"বলো।"

"তুমি সারা জীবন আমাকে এভাবে ধরে রাখবে?"

"রাখব।"

"কথা দাও।"

"কথা দিলাম।"

অ্যাম্বুলেন্সটি তখন এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। ঈশিতা খুব সাবধানে তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের কোনাটি মুছে নিল।

amarboi.com